পরিবেশ ও বিজ্ঞান

সপ্তম শ্রেণি

পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ

প্রথম সংস্করণ: ডিসেম্বর, ২০১৩
দ্বিতীয় সংস্করণ: ডিসেম্বর, ২০১৪
তৃতীয় সংস্করণ: ডিসেম্বর, ২০১৫
চতুর্থ সংস্করণ: ডিসেম্বর, ২০১৬
পঞ্চম সংস্করণ: ডিসেম্বর, ২০১৭

গ্রন্থস্বত্ব : পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ

প্রকাশক :
অধ্যাপিকা নবনীতা চ্যাটার্জি
সচিব, পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ
77/2, পার্ক স্ট্রিট, কলকাতা-700 016

মুদ্রক :
ওয়েস্ট বেঙ্গল টেক্সটবুক কর্পোরেশন
(পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উদ্যোগ)
কলকাতা-৭০০ ০৫৬

सत्यमेव जयते

ভারতের সংবিধান

প্রস্তাবনা

আমরা, ভারতের জনগণ, ভারতকে একটি **সার্বভৌম সমাজতান্ত্রিক ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্র** রূপে গড়ে তুলতে সত্যনিষ্ঠার সঙ্গে শপথ গ্রহণ করছি এবং তার সকল নাগরিক যাতে: সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক **ন্যায়বিচার**; চিন্তা, মতপ্রকাশ, বিশ্বাস, ধর্ম এবং উপাসনার **স্বাধীনতা**; সামাজিক প্রতিষ্ঠা অর্জন ও সুযোগের **সমতা** প্রতিষ্ঠা করতে পারে এবং তাদের সকলের মধ্যে ব্যক্তি-সম্ভ্রম ও জাতীয় ঐক্য এবং সংহতি সুনিশ্চিত করে **সৌভ্রাতৃত্ব** গড়ে তুলতে; **আমাদের গণপরিষদে**, আজ, 1949 সালের 26 নভেম্বর, **এতদ্বারা এই সংবিধান গ্রহণ করছি, বিধিবদ্ধ করছি** এবং **নিজেদের অর্পণ করছি**।

THE CONSTITUTION OF INDIA

PREAMBLE

WE, THE PEOPLE OF INDIA, having solemnly resolved to constitute India into a SOVEREIGN SOCIALIST SECULAR DEMOCRATIC REPUBLIC and to secure to all its citizens : JUSTICE, social, economic and political; LIBERTY of thought, expression, belief, faith and worship; EQUALITY of status and of opportunity and to promote among them all – FRATERNITY assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the Nation; IN OUR CONSTITUENT ASSEMBLY this twenty-sixth day of November 1949, do HEREBY ADOPT, ENACT AND GIVE TO OURSELVES THIS CONSTITUTION.

ভূমিকা

জাতীয় পাঠক্রমের রূপরেখা – ২০০৫ এবং শিক্ষা অধিকার আইন – ২০০৯ দলিল দুটিকে গুরুত্ব দিয়ে ২০১১ সালে পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক গঠিত 'বিশেষজ্ঞ কমিটি' -কে বিদ্যালয় স্তরের পাঠক্রম, পাঠ্যসূচি এবং পাঠ্যপুস্তকগুলির সমীক্ষা ও পুনর্বিবেচনার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল। এই কমিটির বিষয়-বিশেষজ্ঞদের আন্তরিক চেষ্টা ও নিরলস পরিশ্রমের ফসল হলো এই বইটি।

এই বিজ্ঞান বইটি সপ্তম শ্রেণির পাঠ্যসূচি অনুযায়ী প্রণয়ন করা হয়েছে ও নামকরণ করা হয়েছে 'পরিবেশ ও বিজ্ঞান'। অতীব সহজ সরল ভাষায় বইটিতে পরিবেশ, ভৌত ও জীবনবিজ্ঞানের বিভিন্ন অভিমুখ আলোচনা করা হয়েছে। বিভিন্ন ছবি, প্রতিকৃতি, চিত্রের নকশা ব্যবহার করে পরিবেশ ও বিজ্ঞানের মৌলিক ধারণার সঙ্গে শিক্ষার্থীদের পরিচয় ঘটানোর চেষ্টা করা হয়েছে। শিক্ষার্থীদের যাতে তথ্য ভারাক্রান্ত না হতে হয়, সে বিষয়ে লক্ষ্য রাখা হয়েছে। লেখা ও ছবিগুলি যাতে শিশুমনে আকর্ষণীয় হয় সেদিকে নজর রেখে উৎকৃষ্ট মানের কাগজ, কালি ও রং ব্যবহার করা হয়েছে। আশা করি পর্ষদ প্রণীত 'পরিবেশ ও বিজ্ঞান' বইটি শিক্ষার্থীদের কাছে সমাদৃত হবে ও তাদের শিখন সামর্থ্য বাড়বে। অন্যদিকে সক্রিয়তা-নির্ভর অনুশীলনীর মাধ্যমে তাদের বিজ্ঞান ও পরিবেশ বিষয়ে আগ্রহ বাড়াতে সাহায্য করবে।

প্রথিতযশা শিক্ষক - শিক্ষিকা, শিক্ষাপ্রেমী শিক্ষাবিদ, বিষয়-বিশেষজ্ঞ ও অলংকরণের জন্য বিখ্যাত শিল্পীবৃন্দ — যাঁদের ঐকান্তিক চেষ্টায় ও নিরলস পরিশ্রমের ফলে এই সর্বাঙ্গসুন্দর গুরুত্বপূর্ণ বইটির প্রকাশ সম্ভব হয়েছে তাঁদের সকলকে পর্ষদের পক্ষ থেকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই।

পশ্চিমবঙ্গ সর্বশিক্ষা মিশনের সহায়তায় বইটি ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে বিনামূল্যে বিতরণ করা হবে। এই প্রকল্পকে কার্যকরী করার জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শিক্ষা দপ্তর, পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষা অধিকার এবং পশ্চিমবঙ্গ সর্বশিক্ষা মিশন সাহায্য করে পর্ষদকে কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করেছে তা স্বীকার না করলে অন্যায় হবে।

আশা করি পর্ষদ প্রকাশিত এই 'পরিবেশ ও বিজ্ঞান' বইটি শিক্ষার্থীদের কাছে বিজ্ঞানের বিষয়গুলি আকর্ষণীয় করে তুলতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে এবং মাধ্যমিক স্তরে বিজ্ঞানচর্চার মান উন্নততর করতে সহায়ক হবে। ছাত্রছাত্রীরা উদবুদ্ধ হবে। এইভাবে সার্থক হবে পর্ষদের সামাজিক দায়বদ্ধতা।

সমস্ত শিক্ষাপ্রেমী, শিক্ষক-শিক্ষিকা ও সংশ্লিষ্ট সকলের কাছে আমার সনির্বন্ধ অনুরোধ তাঁরা যেন বিনা দ্বিধায় বইটির ত্রুটি-বিচ্যুতি পর্ষদের নজরে আনেন যাতে করে পরবর্তী সংস্করণে সংশোধনের সুযোগ পাওয়া যায়। এতে বইটির মান উন্নত হবে এবং ছাত্রসমাজ উপকৃত হবে। ইংরেজিতে একটি আপ্তবাক্য আছে যে, 'even the best can be bettered'। বইটির উৎকর্ষতা বৃদ্ধির জন্য শিক্ষক সমাজের ও বিদ্যোৎসাহী ব্যক্তিদের গঠনমূলক মতামত ও সুপরামর্শ সাদরে গৃহীত হবে।

ডিসেম্বর, ২০১৭
পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ
৭৭/২, পার্ক স্ট্রিট
কলকাতা-৭০০০১৬

কল্যাণময় গঙ্গোপাধ্যায়
সভাপতি
পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ

প্রাক্‌কথন

পশ্চিমবঙ্গের মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী শ্রীমতী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ২০১১ সালে বিদ্যালয় শিক্ষার ক্ষেত্রে একটি 'বিশেষজ্ঞ কমিটি' গঠন করেন। এই বিশেষজ্ঞ কমিটির ওপর দায়িত্ব ছিল বিদ্যালয় স্তরের সমস্ত পাঠক্রম, পাঠ্যসূচি এবং পাঠ্যপুস্তক- এর পর্যালোচনা, পুনর্বিবেচনা এবং পুনর্বিন্যাসের প্রক্রিয়া পরিচালনা করা। সেই কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী নতুন পাঠক্রম, পাঠ্যসূচি এবং পাঠ্যপুস্তক নির্মিত হলো। পুরো প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রেই জাতীয় পাঠক্রমের রূপরেখা ২০০৫ এবং শিক্ষার অধিকার আইন ২০০৯ (RTE Act, 2009) নথিদুটিকে আমরা অনুসরণ করেছি। পাশাপাশি সমগ্র পরিকল্পনার ভিত্তি হিসেবে আমরা গ্রহণ করেছি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শিক্ষাদর্শের রূপরেখাকে।

উচ্চ-প্রাথমিক স্তরের বিজ্ঞান বইয়ের নাম 'পরিবেশ ও বিজ্ঞান'। জাতীয় পাঠক্রমের রূপরেখা (২০০৫) অনুযায়ী জীবনবিজ্ঞান, ভৌতবিজ্ঞান ও পরিবেশ সমন্বিত আকারে একটি বইয়ের মাধ্যমে পরিবেশিত হলো। সহজ ভাষায় এবং উপযুক্ত দৃষ্টান্তের সহযোগে বিজ্ঞানের বিভিন্ন বুনিয়াদি ধারণা শিক্ষার্থীদের সামনে আমরা উপস্থাপিত করেছি। প্রতিটি ক্ষেত্রে বিভিন্ন চিত্র সংযোজন করা হয়েছে, যাতে শিক্ষার্থীর কাছে বইটি আকর্ষণীয় এবং প্রাঞ্জল হয়ে ওঠে। বিজ্ঞানগ্রন্থ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের উক্তি আমরা স্মরণে রেখেছি—'তাহার ভাষা ও বিষয়বিন্যাস যতদূর সম্ভব সহজ করা উচিত, নতুবা ছাত্রদিগের মানসিক শক্তির অন্যায় এবং নির্দয় অপব্যয় সাধন করা হয়।' (ছাত্রবৃত্তির পাঠ্যপুস্তক)। ষষ্ঠ শ্রেণিতে প্রথম 'বিজ্ঞান' আলাদা বিষয় হিসেবে পাঠ্যপুস্তকে বিন্যস্ত হয়েছে। এই পাঠ্যপুস্তকের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা পরিবেশে আর বিজ্ঞানের পারস্পরিক সম্পর্ক সন্ধানে ব্রতী হবে এবং উৎসাহ নিয়ে বিজ্ঞানকে জীবনের সঙ্গে মিলিয়ে পড়বে, এই আমাদের প্রত্যাশা।

নির্বাচিত শিক্ষাবিদ, শিক্ষক-শিক্ষিকা এবং বিষয়-বিশেষজ্ঞবৃন্দ অল্প সময়ের মধ্যে বইটি প্রস্তুত করেছেন। পশ্চিমবঙ্গের মাধ্যমিক শিক্ষার সারস্বত নিয়ামক পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ পাঠ্যপুস্তকটিকে অনুমোদন করে আমাদের বাধিত করেছেন। বিভিন্ন সময়ে পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শিক্ষা দপ্তর, পশ্চিমবঙ্গ সর্বশিক্ষা মিশন, পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষা অধিকার প্রভূত সহায়তা প্রদান করেছেন। তাঁদের ধন্যবাদ।

পশ্চিমবঙ্গের মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী ড. পার্থ চ্যাটার্জী প্রয়োজনীয় মতামত এবং পরামর্শ দিয়ে আমাদের বাধিত করেছেন। তাঁকে আমাদের কৃতজ্ঞতা জানাই।

বইটির উৎকর্ষবৃদ্ধির জন্য শিক্ষাপ্রেমী মানুষের মতামত, পরামর্শ আমরা সাদরে গ্রহণ করব।

অভীক মজুমদার

ডিসেম্বর, ২০১৭
নিবেদিতা ভবন
পঞ্চমতল
বিধাননগর, কলকাতা : ৭০০০৯১

চেয়ারম্যান
'বিশেষজ্ঞ কমিটি'
বিদ্যালয় শিক্ষা দপ্তর
পশ্চিমবঙ্গ সরকার

বিশেষজ্ঞ কমিটি পরিচালিত পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন পর্ষদ

পুস্তক নির্মাণ ও বিন্যাস

অধ্যাপক অভীক মজুমদার (চেয়ারম্যান, বিশেষজ্ঞ কমিটি)

অধ্যাপক রথীন্দ্রনাথ দে (সদস্যসচিব, বিশেষজ্ঞ কমিটি)

ড.সন্দীপ রায় দেবব্রত মজুমদার পার্থপ্রতিম রায় ড.শ্যামল চক্রবর্তী

সুদীপ্ত চৌধুরী রুদ্রনীল ঘোষ ড.ধীমান বসু দেবাশিস মন্ডল

নীলাঞ্জন দাস বিশ্বজিৎ বিশ্বাস

পরামর্শ ও সহায়তা

অধ্যাপক অমূল্যভূষণ গুপ্ত ড. শীলাঞ্জন ভট্টাচার্য ডাঃ সুব্রত গোস্বামী

ড. অনির্বাণ রায় ডাঃ অমিতাভ চক্রবর্তী ডাঃ পৃথ্বীশ কুমার ভৌমিক

অধ্যাপক মণীন্দ্রনাথ মজুমদার অধ্যাপক রবীন্দ্রনাথ মজুমদার

শিবপ্রসাদ নিয়োগী ডঃ অংশুমান বিশ্বাস

পুস্তক সজ্জা

প্রচ্ছদ ও অলঙ্করণ — দেবাশিস রায়

সহায়তা — হিরাব্রত ঘোষ, অনুপম দত্ত, বিপ্লব মন্ডল

সূচিপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
1. ভৌত পরিবেশ	
(i) তাপ	1-14
(ii) আলো	15-37
(iii) চুম্বক	38-48
(iv) তড়িৎ	49-62
(v) পরিবেশবান্ধব শক্তি	63-69
2. সময় ও গতি	70-84
3. পরমাণু, অণু ও রাসায়নিক বিক্রিয়া	85-100
4. পরিবেশ গঠনে পদার্থের ভূমিকা	101-144
5. মানুষের খাদ্য	145-181
6. পরিবেশের সজীব উপাদানের গঠনগত বৈচিত্র্য ও কার্যগত প্রক্রিয়া	182-226
7. পরিবেশের সংকট, উদ্ভিদ ও পরিবেশের সংরক্ষণ	227-255
8. পরিবেশ ও জনস্বাস্থ্য	256-307
পাঠ্যসূচি ও নমুনা প্রশ্ন	308-315
শিখন পরামর্শ	316-317

‘পরিবেশ ও বিজ্ঞান’ বই নিয়ে কিছু কথা

এই বইয়ের নাম কেন ‘পরিবেশ ও বিজ্ঞান ’ সেই নিয়ে প্রশ্ন উঠতে পারে। আমাদের মনে হয়েছে যে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত শিশুদের প্রথমে পরিবেশের নানান ঘটনা ও বৈচিত্র্যের প্রতি কৌতূহলী ও অনুসন্ধিৎসু করে তোলা প্রয়োজন। বিজ্ঞানের দিকে শিশুর যাত্রা তার চেনা পৃথিবী থেকে, যেখানে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যতাই সবচেয়ে গুরুত্ব পায়। সেই কারণে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত বইয়ের নাম ‘আমাদের পরিবেশ’। পরিবেশ পর্যবেক্ষণ থেকে মানুষ যখন ধীরে ধীরে আরো জানতে চায় তখন সে অনুভব করে যে শুধু পরিবেশ পর্যবেক্ষণই যথেষ্ট নয়। সেকাজে তখন প্রয়োজন বিজ্ঞানের, যে বিজ্ঞান তার জ্ঞানের যাত্রায় আলোকবর্তিকা। এই কারণেই ষষ্ঠ শ্রেণি থেকে বইয়ের নাম ‘পরিবেশ ও বিজ্ঞান’।

আমরা ছাত্রছাত্রীকে বিজ্ঞানের প্রথাগত (Formal) ধারণায় দীক্ষিত করতে চাই, কিন্তু সে যাত্রায় আমরা অনুসরণ করব শিখনের Constructivist ধারণার পথই। আজ সারা বিশ্বে পঠনপাঠনে অনুসৃত এই Constructivist ধারণার মূল কথা হলো শিক্ষার্থীকে তার পরিচিত জগৎ থেকে তার মনোজগতের ধারণাসমূহের সাহায্য নিয়ে ও পরীক্ষানিরীক্ষার মাধ্যমে বিজ্ঞান শিক্ষায় দীক্ষিত করা। সেই কারণে যতদূর সম্ভব নানাভাবে অনুসন্ধানের (Exploration) সাহায্য নেওয়া হয়েছে, বহুসংখ্যক হাতেকলমে পরীক্ষার উল্লেখ করা হয়েছে। এই সবপরীক্ষা অল্প চেষ্টায়, অল্প খরচেই করা সম্ভব। হাতেকলমে পরীক্ষার মাধ্যমে শিক্ষার্থী বিজ্ঞানের নানান বিষয় আরো ভালোভাবে শিখতে পারবে। যেহেতু বিজ্ঞানের সবকিছুই Intuitive নয়, তাই শিক্ষক / শিক্ষিকাকে Concept Learning ও Knowledge Construction- এর বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে সচেতন হয়ে ছাত্রছাত্রীদের শিখন পরিচালনা করতে হবে।

এই বইটির অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো এটি সমন্বয়ী প্রচেষ্টার (Integrated Approach) ফসল। আমরা মনে করি দুটি প্রচ্ছদের মধ্যে জীববিদ্যা , রসায়ন, পদার্থবিজ্ঞান ও পরিবেশ অন্তর্ভুক্ত করলেই সমন্বয় সাধন হয়ে যায় না। বিভিন্ন বিষয়ের মধ্যে যথাযথ সম্পর্ক স্থাপন এবং মেলবন্ধনের চেষ্টাই এই বইকে অন্য মাত্রা দেবে বলে আমাদের বিশ্বাস। ‘পরিবেশ ও বিজ্ঞান’ বইটিতে সহজ ভাষায় জীববিজ্ঞান, রসায়ন ও পদার্থবিদ্যার মেলবন্ধনের চেষ্টা করা হয়েছে, সেই দিক থেকে দেখলে এই বইটি পথিকৃৎ।

বিজ্ঞানে তথ্যানুসন্ধান ও সংগৃহীত তথ্যের যথাযথ লিপিবদ্ধকরণ অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। আমাদের এই বইয়ের পাঠক ও পাঠিকাদের বহুক্ষেত্রেই Open-ended প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হবে। এই ধরনের প্রশ্ন / কর্মপত্র ছাত্রছাত্রীদের অনুসন্ধিৎসা বৃদ্ধি ও পাঠ্যবইয়ের বাইরের জগৎ থেকে জ্ঞান আহরণে উৎসাহী করে তুলতে সংযোজিত হয়েছে। এটিও এই বইয়ের অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

বইটি সম্বন্ধে যে-কোনো গঠনমূলক পরামর্শ সাদরে গৃহীত হবে।

1 ভৌত পরিবেশ

তাপ

ঠান্ডা ও গরমের ধারণা

নীচের ছবিগুলো দেখো

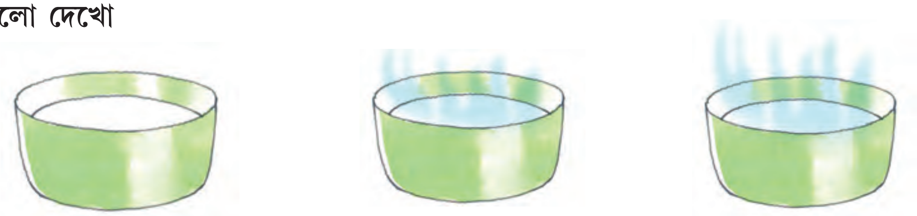

ওপরের ছবিতে তিনটি বাটির একটিতে ঠান্ডা জল আর অন্য দুটিতে ভিন্ন মাত্রার গরম জল আছে। আঙুল ডুবিয়ে যদি তিনটি পাত্রের জলের গরম অবস্থার বর্ণনা দিতে চাও তাহলে কীভাবে ওই অবস্থার বর্ণনা করবে?

উত্তরটা হয় 'ঠান্ডা' অথবা 'গরম' অথবা 'বেশি গরম'।

কিন্তু যদি বিভিন্ন মাত্রার গরম জলের অনেকগুলো পাত্র নেওয়া হয়, একই ধরনের শব্দ দিয়ে তাদের গরম বা ঠান্ডা অবস্থাকে আলাদা করে বোঝানো প্রায় অসম্ভব হয়ে দাঁড়াবে।

অথচ আমরা চাই যে নানারকমের ঠান্ডা-গরম অবস্থার বর্ণনা দেওয়ার ক্ষমতা আমাদের থাকুক। যখন শব্দ দিয়ে এটা হচ্ছে না, এমন কিছু কি তোমার মনে আসছে যা দিয়ে এটা সম্ভব?

নানারকমের টাকার হিসাব আমরা সংখ্যা দিয়ে করি। নানারকম ওজন আমরা সংখ্যা দিয়ে বোঝাই, এখানেও কি ওইভাবে সংখ্যা ব্যবহার করা সম্ভব?

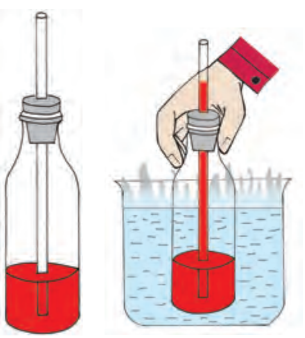

বিভিন্ন ঠান্ডা-গরম অবস্থা প্রকাশের জন্যও তাই বিভিন্ন সংখ্যা ব্যবহার করা হয়। এখন প্রশ্ন, কতটা ঠান্ডা বা কতটা গরমের জন্য কোন সংখ্যা, তা ঠিক হবে কীভাবে? চলো নীচের পরীক্ষাটি থেকে এই প্রশ্নের উত্তর আন্দাজ করা যাক।

উষ্ণতা ও তার পরিমাপ ঃ

উপকরণ ঃ 1) ঢাকনাওয়ালা একটি ছোটো কাচের শিশি।
2) কিছুটা রঙিন জল।
3) পেনের সরু খালি রিফিল।
4) এক বাটি গরম জল।

পদ্ধতি : খালি শিশিতে কিছুটা রঙিন জল নাও। জলের পরিমাণ এমন হবে যাতে শিশির মধ্যে বায়ুপূর্ণ স্থানের পরিমাণ বেশি হয়। ওই শিশির মুখটা ভালো করে আটকাও। শিশির ছিপিতে ডট পেনের দু-মুখ খোলা ফাঁকা সরু রিফিলের নলটা ঢোকাবার মতো একটা ফুটো করো। ওই ফুটো দিয়ে ওই ফাঁকা রিফিল ঢোকাও। মুখে মাখার ক্রীম বোতল আর রিফিলের জোড়ের মুখে লাগাও।

শিশিটাকে কিছুক্ষণ বাটির গরম জলের মধ্যে এমন ভাবে ডুবিয়ে রাখো যাতে শিশির বায়ুপূর্ণ স্থানের

বেশিরভাগটা জলের তলায় থাকে। কী দেখলে? রিফিলের নল দিয়ে রঙিন জল কি কিছুটা উপরে উঠল? জল যতটা উঠল সেখানে নলের গায়ে একটা দাগ দাও।

এবার বাটির জলটা আরও একটু বেশি গরম করে পরীক্ষাটা আবার করো। দেখত এবার রঙিন জল রিফিলের নল দিয়ে বেশি উচ্চতায় উঠল কিনা। জল যতদূর উঠল সেখানে নলের গায়ে আবার দাগ দাও।

তোমার জ্যামিতি বাক্সের স্কেল দিয়ে সহজেই তুমি দাগ অবধি রঙিন জলের উচ্চতা মাপতে পারো। যার ফলে তুমি দুটি আলাদা সংখ্যা পাবে যা দৈর্ঘ্যের মান বোঝায়। নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ এই দুরকম দৈর্ঘ্যের জন্য দুটি আলাদা সংখ্যা পাওয়ার কারণ কী। বাটির জল দু-বার দু-রকম গরম ছিল। তাই রঙিন জল দু-বার দু-রকম উচ্চতায় উঠেছে। আমরা দুরকম গরমের জন্য দুটি আলাদা সংখ্যা পেয়েছি।

এইভাবে বিভিন্ন গরম-ঠান্ডা অবস্থার জন্য সংখ্যা ঠিক করতে অপর একটি রাশির (যেমন- এক্ষেত্রে দৈর্ঘ্য) সাহায্য নেওয়া হয়।

তোমরা বাড়িতে জ্বর মাপার জন্য থার্মোমিটার দেখেছ। জ্বর বাড়লে ওই থার্মোমিটারের মধ্যে সরু সুতোর মতো পারদসূত্রের দৈর্ঘ্য বাড়ে। তবে থার্মোমিটারের গায়ে লেখা সংখ্যাটি কিন্তু দৈর্ঘ্যের মাপ নয়। পারদসূত্রের দৈর্ঘ্য যেভাবে বাড়ে তার সঙ্গে সম্পর্ক রেখেই থার্মোমিটারের গায়ের সংখ্যাগুলি ঠিক করা হয়েছে। গরম বা ঠান্ডা অবস্থা প্রকাশের জন্য এভাবে যে সংখ্যা পাওয়া যায় তাকে আমরা বলি উষ্ণতার পরিমাপ। উষ্ণতা মাপার জন্য থার্মোমিটার তৈরি করা হয়। বিভিন্নরকম গরমের সংস্পর্শে পারদসূত্র যখন বিভিন্ন উচ্চতায় ওঠে তখন তা বিভিন্ন উষ্ণতা বোঝায়।

নীচের ছবিদুটি লক্ষ করো।

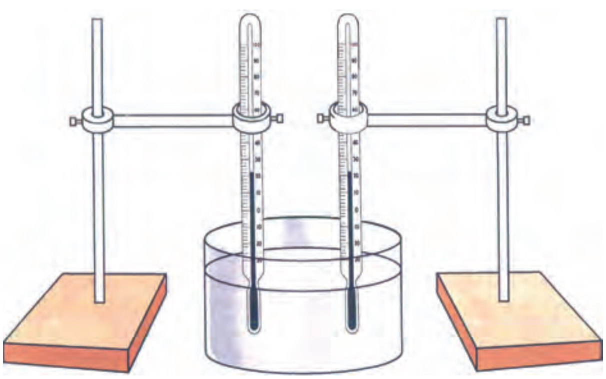

ছবি :1

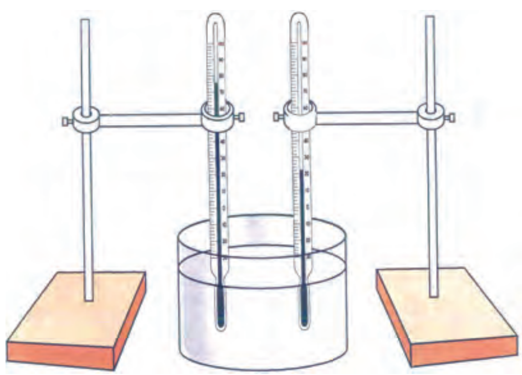

ছবি :2

দুটি থার্মোমিটার একই রকম। দুটি ছবিতেই থার্মোমিটার দুটি একই তরলের মধ্যে ডোবানো আছে।

1 নং ছবিতে থার্মোমিটার দুটির পারদসূত্রের উচ্চতা সঠিকভাবে দেখানো হয়েছে কি? যুক্তি দিয়ে লেখো।

2 নং ছবিতে থার্মোমিটার দুটির পারদসূত্রের উচ্চতা কি সঠিক দেখানো আছে? তোমার উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও।

দুটি আলাদা পাত্রে তরল নেওয়া হলো। পাশের ছবিটিতে থার্মোমিটারের পারদসূত্রের উচ্চতা দেখে বলো কোন পাত্রের তরলের উষ্ণতা বেশি - ‘ক’ না ‘খ’?

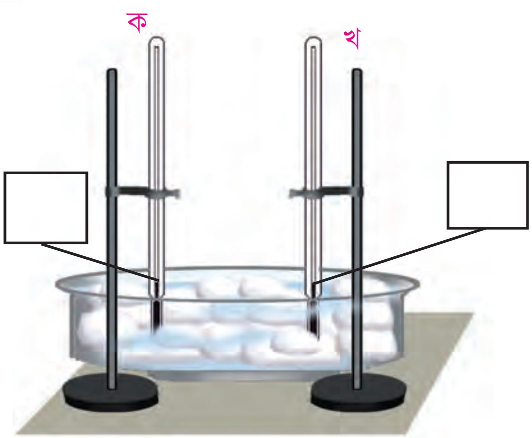

পাশের ছবিতে হুবহু একই ধরনের গঠনের থার্মোমিটার ‘ক’ ও ‘খ’ দেখানো হয়েছে। দুটি থার্মোমিটারেরই পারদকুণ্ড একটি পাত্রে রাখা বরফের মধ্যে ডোবানো আছে। এই অবস্থায় থার্মোমিটার দুটির পারদসূত্র যে উচ্চতায় উঠেছে সেখানে দাগ কাটা হয়েছে। ছবিতে ওই দুটি দাগের পাশে নিজের ইচ্ছে মতো দুটি আলাদা সংখ্যা বসাও।

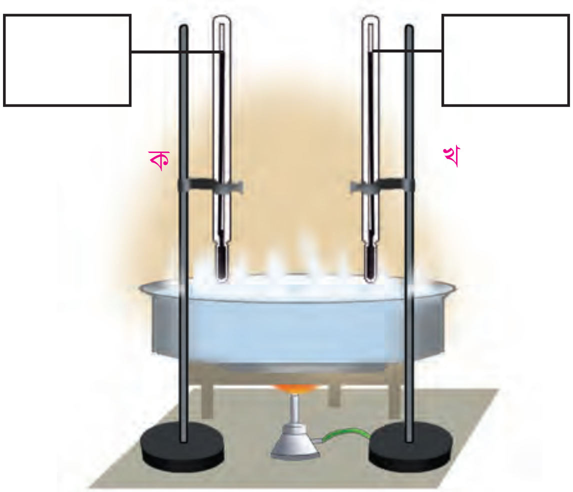

পাশের ছবিতে পাত্রের জলটা ফুটছে। ফুটন্ত জলের একটু উপরে উপরোক্ত থার্মোমিটার দুটির পারদকুণ্ড রাখলে পারদসূত্রের উচ্চতা বাড়তে বাড়তে একসময় স্থির হয়। থার্মোমিটারের যে উচ্চতায়পারদসূত্র উঠবে সেখানে একটা দাগ দেওয়া হয়। ওই দাগটা ওই গরমের মাত্রায় পারদসূত্রের উচ্চতা কতটা তাকে দেখায়। ছবিতে ‘ক’ ও ‘খ’ থার্মোমিটারে যে দুটি দাগ দেওয়া আছে তার পাশে নিজের ইচ্ছে মতো দুটি আলাদা সংখ্যা লেখো, যে সংখ্যা দুটি আগের ছবিতে বরফে ডোবানো থার্মোমিটারের গায়ে লেখা সংখ্যা দুটির চাইতে বেশি।

নীচে সঠিক স্থানে তোমার ভাবা সংখ্যাগুলো লেখো।

পারদসূত্র যেখানে উঠেছে	ক-থার্মোমিটার	খ-থার্মোমিটার
গরম বাষ্পে রাখার পর (U)		
বরফে ডোবানোর পর (L)		
U–L (বিয়োগফল)		
দুটি দাগের মধ্যবর্তী অঞ্চলকে কত ভাগে ভাগ করলে একটি ভাগকে 'এক' বলা যাবে? এই একটি ভাগকে এক ডিগ্রি বলা হয়।		

পাশের ছবিটি ভালো করে দেখো —

'ক' ও 'খ' দুটি থার্মোমিটারই একরকম। একই জিনিস দিয়ে তৈরি। একটি পাত্রে বরফ ও বরফ-গলে-পাওয়া জল একসঙ্গে আছে। জল ও বরফের ওই মিশ্রণের মধ্যে দুটি থার্মোমিটারের পারদকুণ্ড ছবির মতো করে ডোবানো হলো।

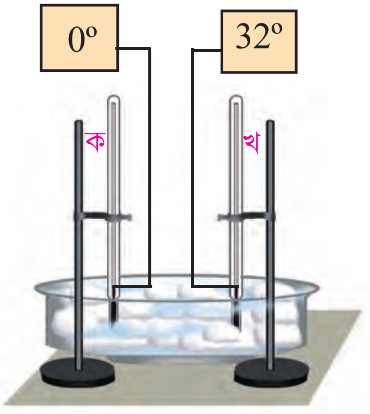

নীচের সারণিটি ভালো করে দেখো ও পারদসূত্র যে উচ্চতায় উঠেছে তার গায়ে লেখা সংখ্যা দুটি লক্ষ করো।

সারণি - 1

	ক	খ
পারদ স্তম্ভের উচ্চতা	ক ও খ-তে একই	
পারদসূত্র যে উচ্চতায় রয়েছে সেখানে সংখ্যা দিয়ে প্রকাশিত গরমের মাত্রা (L)	0°	32°

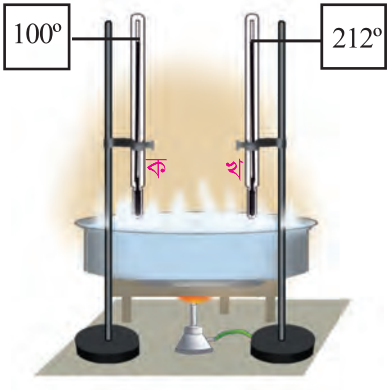

পাশের চিত্রে 'ক' ও 'খ' দুটি থার্মোমিটারই একরকম। দুটি থার্মোমিটারেরই কুণ্ডকে একই পাত্রে রাখা ফুটন্ত জলের ওপরের বাষ্পে রাখা হলো। পারদসূত্র যেখানে উঠল সেখানে সংখ্যা লিখে গরমের মাত্রা বোঝানো হয়েছে।

নীচের সারণিটি দেখো ও সংখ্যাদুটি লক্ষ করো।

সারণি - 2

	ক	খ
পারদ স্তম্ভের উচ্চতা	ক ও খ-তে একই	
সংখ্যা দিয়ে প্রকাশিত বেশি গরমের মাত্রা (U)	100°	212°

সারণি - 1 ও সারণি - 2 মিলিয়ে লেখো :-

	ক	খ
বরফ জলে ডোবানোর পর লেখা সংখ্যা (L)		
ফুটন্ত জলের উপরে রাখার পর লেখা সংখ্যা (U)		
U – L		
দুটি দাগের মধ্যবর্তী অঞ্চলকে কয় ভাগে ভাগ করলে একটি ভাগকে এক ডিগ্রি বলা যাবে?		

উপরে নেওয়া 'ক' থার্মোমিটারকে যেভাবে সংখ্যা লিখে ভাগ করা হয়েছে তাকে বলে সেলসিয়াস স্কেল, আর 'খ' থার্মোমিটারকে যেভাবে ভাগ করা হয়েছে তাকে বলে ফারেনহাইট স্কেল। সেলসিয়াসকে C ও ফারেনহাইটকে F দিয়ে বোঝানো হয়।

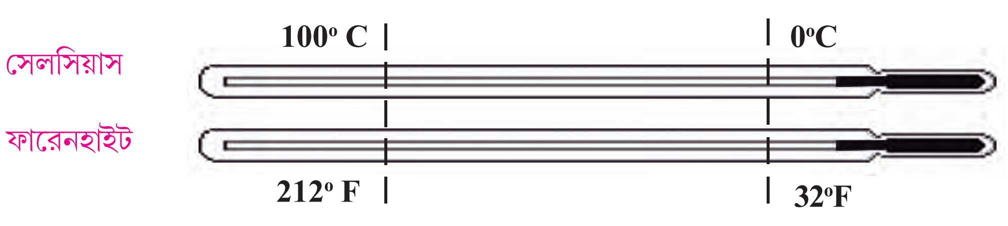

রেখা দিয়ে বোঝানো সেলসিয়াস ও ফারেনহাইট থার্মোমিটারের স্কেলের ছবি পাশে দেওয়া হলো।

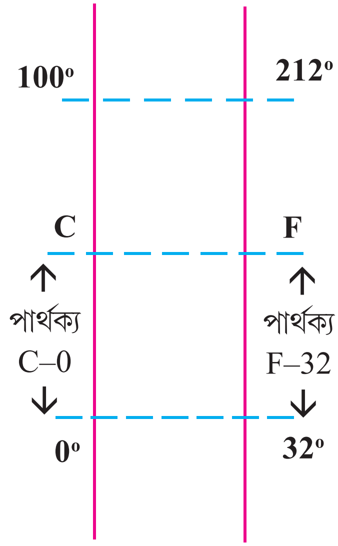

ধরা যাক, একটি নির্দিষ্ট বস্তুর উষ্ণতা সেলসিয়াস স্কেলে 'C' ও ফারেনহাইট স্কেলে 'F' পাঠ দেখাচ্ছে।

সেলসিয়াস স্কেলে 0^o থেকে C -এর দূরত্ব এবং ফারেনহাইট স্কেলে 32^o থেকে F -এর দূরত্ব সমান।

এবার বলত, 0^o থেকে C-এর মধ্যে কতগুলি ঘর আছে, এবং 32^o থেকে F-এর মধ্যে কতগুলি ঘর আছে?

আগেই দেখেছ সেলসিয়াস স্কেলের 100 ঘর সবসময় ফারেনহাইট স্কেলের 180 ঘরের সমান।

তাহলে সেলসিয়াস স্কেলের 1 সংখ্যক ঘর সবসময় ফারেনহাইট স্কেলের $\frac{180}{100}$ ঘরের সমান।

অতএব, সেলসিয়াস স্কেলের C সংখ্যক ঘর সবসময় ফারেনহাইট স্কেলের $\frac{180\,C}{100}$ সংখ্যক ঘরের সমান।

তাহলে লেখা যায়,

$$\frac{180C}{100} = F\text{-}32$$

বা, $\frac{9C}{5} = F\text{-}32$

বা, $\frac{C}{5} = \frac{F\text{-}32}{9}$

আবার, $\frac{9C}{5} = F\ \text{-}32$ হলে

বা, $C = \frac{5}{9}(F\text{-}32)$

এবার 40^oC কত ডিগ্রি ফারেনহাইটের সমান তা কষে বের করো।

উষ্ণতার পরিবর্তন ও তাপের ধারণা ঃ

শীতকালে ঠান্ডা জলের সঙ্গে গরম জল মিশিয়ে আমরা অনেকেই স্নান করি। এসো দেখি তা থেকে আমরা কি নতুন বিষয় শিখতে পারি।

নীচের ছবিদুটি লক্ষ করো

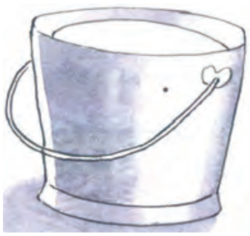

বালতিতে 15°C উষ্ণতায় জল

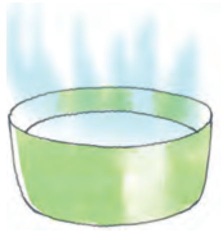

গামলাতে 97°C উষ্ণতায় জল

এবার বলো, বালতির জল ও গামলার জল মিশিয়ে দিলে কী হবে?

ঠিক উত্তরের পাশে '✓' দাও

মেশানো জল গামলার জলের চাইতে কম গরম ☐

মেশানো জল বালতির জলের চাইতে বেশি গরম ☐

তুমি দেখতে পেলে যে দুটি আলাদা উষ্ণতার বস্তু সংস্পর্শে এলে একটির উষ্ণতা বাড়ে ও অন্যটির উষ্ণতা কমে। এখন প্রশ্ন এটা কেন হয়?

যে বস্তুটির উষ্ণতা বাড়ল ভাবা যেতে পারে যে সে বাড়তি কিছু পেল । একইভাবে যার উষ্ণতা কমল সে কিছু হারাল।

দুটি ভিন্ন উষ্ণতার বস্তু পরস্পরের সংস্পর্শে এলে যা হারায় বা যা বাড়তি পায় তাকেই আমরা বলি তাপ (Heat)।

তাহলে যখন কোনো বস্তুর উষ্ণতা বাড়েও না বা কমেও না, স্থির থাকে অর্থাৎ বস্তুটি কিছু বাড়তি পায়ও না বা হারায়ও না তখন তাপের কথা ভাবার প্রয়োজন পড়ে না। ওপরের পরীক্ষায় গরম ও ঠান্ডা জলের উষ্ণতার পরিবর্তন ঘটলেও জল তরলই ছিল, তার অবস্থার কোনো পরিবর্তন ঘটেনি। কিন্তু পরে আমরা দেখবো যে কোনো পদার্থের যখন অবস্থার পরিবর্তন ঘটে (পদার্থটি কঠিন থেকে তরল হয়, বা তরল থেকে বাষ্প হয়, বা বাষ্প থেকে তরল হয় ইত্যাদি) তখন তাপ গ্রহণ বা বর্জন করা সত্ত্বেও ওই পদার্থটির উষ্ণতার কোনো পরিবর্তন হয় না।

গৃহীত বা বর্জিত তাপের পরিমাপ

দুটি হুবহু একই রকম পাত্র নেওয়া হলো। পাত্রদুটিতে ঘরের উষ্ণতায় (ধরি,25°C) সমান পরিমাণে জল নেওয়া হলো। একই বার্নার দিয়ে পাত্রদুটির জলকে পরপর গরম করা হলো। ধরো, প্রথম পাত্রের জলকে 50°C পর্যন্ত ও দ্বিতীয় পাত্রের জলকে 75°C পর্যন্ত উত্তপ্ত করা হলো। (শূন্যস্থান পূরণ করো এবং উপযুক্ত স্থানে '✓' দাও।)

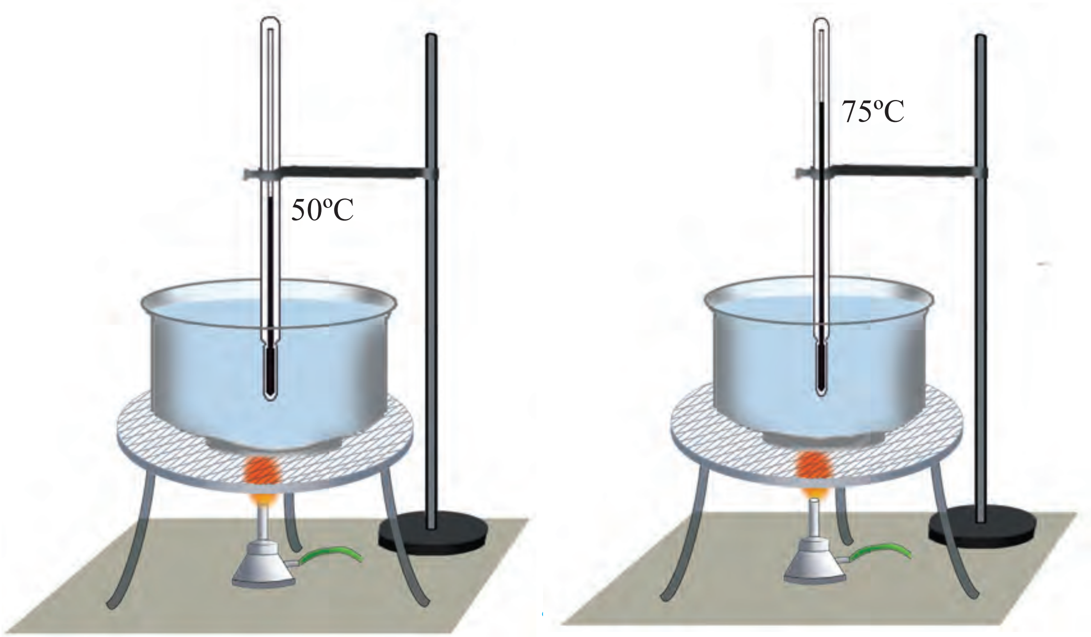

দ্বিতীয় পাত্রের জলের উষ্ণতা কতটা বাড়ানো হলো? .... °C।

কোন পাত্রের জলকে উত্তপ্ত করতে বেশি তাপ দিতে হয়েছে বলে তোমার মনে হয়?

এখন 50°C ও 75°C উষ্ণতার জল সহ পাত্র দুটোকে ঘরের উষ্ণতায় (25°C) রেখে দেওয়া হলো।

তাহলে ওই দুই পাত্রের জলই আলাদা আলাদা করে তাপ হারিয়ে কোনো না কোনো সময়ে ঘরের উষ্ণতায় আসবে। অর্থাৎ প্রথম পাত্রের জলের উষ্ণতা কমবে (50-25)°C=25°C আর দ্বিতীয় পাত্রের জলের উষ্ণতা কমবে (75-25)°=50°C।

ভেবে বলো তো কোন পাত্রের জল বেশি তাপ হারিয়েছে?

তাহলে বলা যায়-

নির্দিষ্ট ভরের কোনো বস্তু বাইরে থেকে কতটা তাপ নিয়েছে বা কতটা তাপ ওই বস্তু থেকে বাইরে বেরিয়ে গেছে সেটা নির্ভর করে ওই বস্তুর উষ্ণতা আগের থেকে কতটা বাড়ল বা কমল তার উপর। উষ্ণতা বৃদ্ধির পরিমাণ যদি দ্বিগুণ হয় তবে বস্তুর নেওয়া তাপের পরিমাণও দ্বিগুণ হবে। একটি বস্তুর উষ্ণতা 10°C থেকে 20°C করতে যতটা তাপ দরকার 20°C থেকে 40°C করতে তার দ্বিগুণ তাপ দরকার।

বস্তু বাইরে থেকে যতটা তাপ নেয় বা বাইরে যতটা তাপ ছেড়ে দেয় তার সঙ্গে বস্তুর উষ্ণতা বৃদ্ধি বা উষ্ণতা হ্রাসের সরল সম্পর্ক রয়েছে।

একটা পাত্রে একগ্লাস জল নেওয়া হলো। জলের উষ্ণতা 25°C। একটি বার্নার দিয়ে ওই জলকে 50°C পর্যন্ত উত্তপ্ত করা হলো। এবার ওই পাত্র খালি করে তাতে কুড়ি গ্লাস জল নেওয়া হলো। জলের উষ্ণতা এবারেও 25°C। ওই বার্নার দিয়ে এই জলের উষ্ণতা বাড়িয়ে আবার 50°C করা হলো।

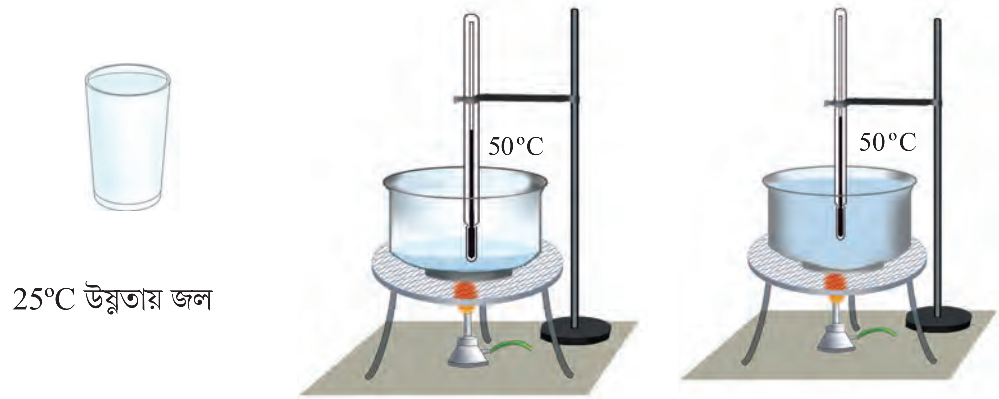

ভেবে বলো তো কোন ক্ষেত্রে জল 25°C থেকে 50°C অবধি উত্তপ্ত হতে বেশি তাপ নেবে? এক গ্লাস জল না কুড়ি গ্লাস জল?

উষ্ণতা একই পরিমাণ বাড়াতে এক বাটি জলের যত তাপ লাগে, এক বালতি জলের তার চেয়ে অনেক বেশি তাপ লাগে — এটা নিশ্চয়ই তোমরা বাড়িতে লক্ষ করেছ।

তাই বলা যায় উপাদান একই থাকলে উষ্ণতা একই পরিমাণ বাড়াতে বেশি ভরের বস্তুর বেশি তাপ দরকার।

উষ্ণতা নির্দিষ্ট পরিমাণ বাড়া বা কমার জন্য কোনো বস্তু কতটা তাপ বাইরে থেকে নেবে বা হারাবে, সেটা ওই বস্তুটার ভরের সঙ্গে সরল সম্পর্কে থাকে।

এবার হুবহু একরকম দুটো পাত্র নেওয়া হলো। একটা পাত্রে এক বাটি দুধ আর অন্য পাত্রে একই ভরের জল নেওয়া হলো। ধরা যাক দুধ ও জল উভয়েই ঘরের উষ্ণতায় (25°C) আছে।

এবার একই ধরনের দুটি বার্নার দিয়ে দুধ ও জল আলাদা করে একই সময় ধরে উত্তপ্ত করা হলো।

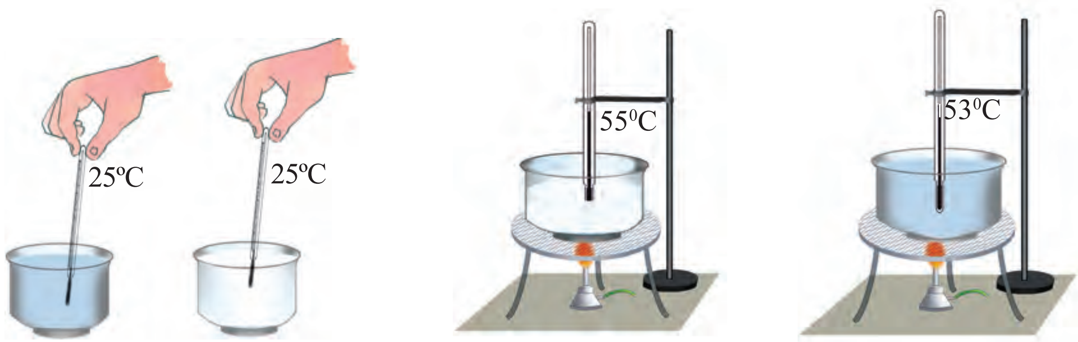

দেখা যায়, একই সময় ধরে উত্তপ্ত করা সত্ত্বেও দুই তরলের উষ্ণতা আলাদা আলাদা হয়, দুধের উষ্ণতা জলের চেয়ে বেশি হয়।

যেহেতু একই সময় ধরে গরম করা হয়েছে, তাহলে ধরে নেওয়া যায় ওই দুই তরলকে একই পরিমাণ তাপ দেওয়া হয়েছে।

এক্ষেত্রে সমান ভরের দুটি আলাদা পদার্থে সমপরিমাণ তাপ দেওয়া হলেও উষ্ণতা বৃদ্ধি সমান হয়নি। এ থেকে বলা যেতে পারে উষ্ণতা বৃদ্ধি বা হ্রাসের জন্য একটি বস্তু কতটা তাপ গ্রহণ বা বর্জন করবে তা বস্তুটি কোন পদার্থ দিয়ে তৈরি তার উপর নির্ভর করে।

তাহলে নীচের তালিকাটি পূরণ করো-

কোনো বস্তুর উষ্ণতা বৃদ্ধি বা হ্রাসের জন্য বাইরে থেকে কতটা তাপ নেবে বা হারাবে তা যে যে বিষয়গুলোর ওপর নির্ভর করে সেগুলো হলো

তাপের পরিমাপ করার জন্য SI পদ্ধতিতে যে একক ব্যবহার করা হয় তা হলো জুল। এছাড়াও অন্য একটি এককও তাপ পরিমাপের জন্য প্রচলিত। সেটি হলো ক্যালোরি। ক্যালোরি কিন্তু SI একক নয়।

তাপ প্রয়োগে পদার্থের অবস্থার পরিবর্তন

এসো একটা পরীক্ষা করা যাক।

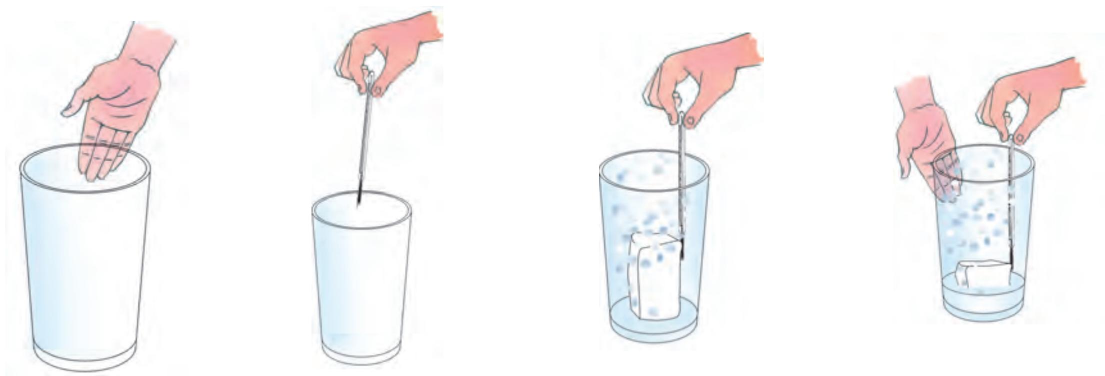

ঘরের উষ্ণতায় (ধরো 25°C) একটা গ্লাস নাও। এবার গ্লাসটার মধ্যে একটা বড়ো মাপের (গ্লাসের মধ্যে রাখা যায় এমন) বরফের টুকরো নাও। যদি একটা থার্মোমিটার দিয়ে তুমি বরফটার উষ্ণতা মাপতে তাহলে তুমি থার্মোমিটারে এই পাঠ 0°C পেতে।

এই অবস্থায় কিছুক্ষণ রেখে দাও এবং কী ঘটছে তা লক্ষ করো। দেখতে পাচ্ছ বরফটা গলছে আর জলে পরিণত হচ্ছে।

এবার আবার থার্মোমিটার দিয়ে বরফটার উষ্ণতা পরিমাপ করো। দেখা গেল এবারেও বরফের উষ্ণতা 0°C, অর্থাৎ বরফের উষ্ণতার কোনো পরিবর্তন হচ্ছে না।

এবার গ্লাসটার গায়ে হাত দিয়ে দেখো।

দেখবে গ্লাসটা অনেকটা ঠান্ডা হয়ে গেছে। যদি তুমি থার্মোমিটার দিয়ে গ্লাসটার উষ্ণতা মাপতে, তবে দেখতে গ্লাসের উষ্ণতা 25°C-র চেয়ে অনেক কমে গেছে।

নীচের সারণিটি পূরণ করো

পরীক্ষা শুরুর আগে	পরীক্ষা চলাকালীন অবস্থায় উষ্ণতা বাড়ছে/ কমছে/একই রয়েছে
বরফের উষ্ণতা = 0°C গ্লাসের উষ্ণতা = 25°C	

এভাবেই বারবার বরফ আর গ্লাসের উষ্ণতা মাপতে থাকলে, তুমি দেখতে পাবে, পুরো বরফটা গলে জলে পরিণত না হওয়া পর্যন্ত বরফের উষ্ণতার কোনো পরিবর্তন ঘটছে না। কিন্তু গ্লাসে বরফ নেওয়ার পর থেকেই গ্লাসের উষ্ণতা কমতে থাকছে।

তাহলে গ্লাস নিশ্চয়ই তাপ হারিয়েছে। তবে সেই তাপ গেল কোথায়?

তাহলে কী বরফের এই জলে পরিণত হওয়া আর গ্লাসের তাপ হারানোর মধ্যে কোনো সম্পর্ক আছে?

আসলে গ্লাস কিছু তাপ হারিয়েছে। আর সেই তাপ গ্রহণ করেছে বরফ। আর তাতেই বরফ গলে জলে পরিণত হয়েছে। কিন্তু বরফের গ্রহণ করা এই তাপ বরফের উষ্ণতার কোনো পরিবর্তন ঘটায়নি। তাই এই তাপকে লীন তাপ বলে।

যে-কোনো পদার্থই তার এক অবস্থা থেকে অন্য অবস্থায় বদলে যাওয়ার সময়ে বাইরে থেকে কিছু লীন তাপ সংগ্রহ করে অথবা হারায়। কিন্তু এই তাপ ওই পদার্থের উষ্ণতার কোনো পরিবর্তন ঘটায় না।

এক্ষেত্রে 0°C উষ্ণতার বরফ লীন তাপ সংগ্রহ করে 0°C উষ্ণতার জলে পরিণত হয়েছে।

এইভাবে পদার্থের কঠিন অবস্থা থেকে তরল অবস্থায় পরিণত হওয়ার ঘটনাকে '**গলন**' বলে। আর এই পরিবর্তনের সময় পদার্থ যে তাপ গ্রহণ করে তাকে গলনের লীন তাপ বলে।

যেমন বরফ গলনের লীন তাপ 80 ক্যালোরি/ গ্রাম। অর্থাৎ 0°C উষ্ণতার 1 গ্রাম বিশুদ্ধ বরফ ওই উষ্ণতার 1 গ্রাম বিশুদ্ধ জলে পরিণত হতে বাইরে থেকে 80 ক্যালোরি তাপ গ্রহণ করে।

এবার জেনে নেওয়া যাক, পদার্থের অবস্থার পরিবর্তন কত রকমের হয়। নীচের তালিকাটা ভালো করে লক্ষ করো:

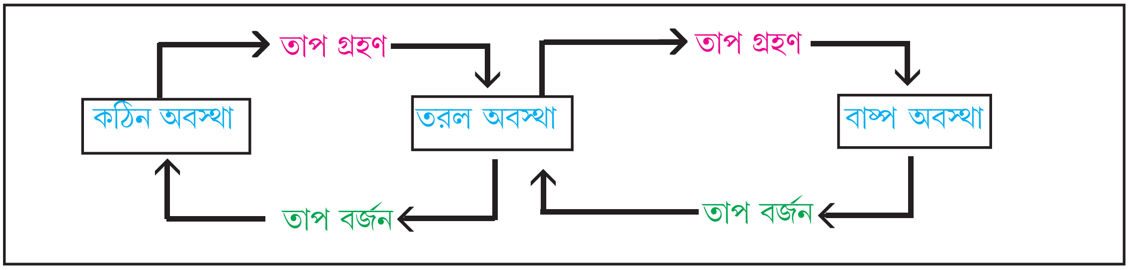

এবার নীচের সারণিটা পূরণ করো—

পদার্থ কোন অবস্থা থেকে কোন অবস্থায় বদলাচ্ছে	অবস্থার পরিবর্তনের নাম	লীন তাপ গ্রহণ/বর্জন	লীনতাপের নাম
কঠিন থেকে তরল	গলন		গলনের লীন তাপ
তরল থেকে কঠিন	কঠিনীভবন	বর্জন	
তরল থেকে বাষ্প	বাষ্পীভবন	গ্রহণ	
বাষ্প থেকে তরল	ঘনীভবন		

একক ভরের কোনো পদার্থের উষ্ণতার পরিবর্তন না ঘটিয়ে যদি শুধু অবস্থার পরিবর্তন ঘটানো হয়, তখন ওই পদার্থ বাইরে থেকে যে পরিমাণ তাপ গ্রহণ বা বর্জন করে, সেই পরিমাণ তাপকেই ওই পদার্থের ওই অবস্থা পরিবর্তনের লীন তাপ বলে।

‘ক’ এবং ‘খ’ তালিকা দুটো ভালোভাবে লক্ষ করো। জল তার বিভিন্ন অবস্থা পরিবর্তনের জন্য বাইরে থেকে কতটা লীন তাপ গ্রহণ বা বর্জন করে তা এই তালিকা থেকে জানতে পারবে।

ক তালিকা

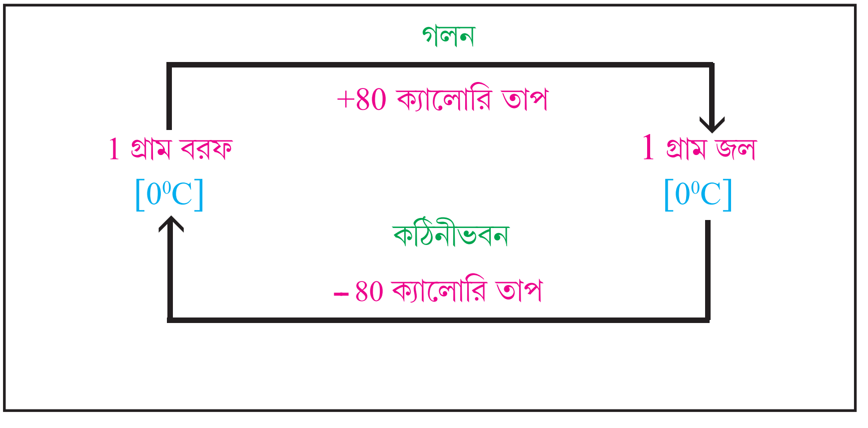

খ তালিকা

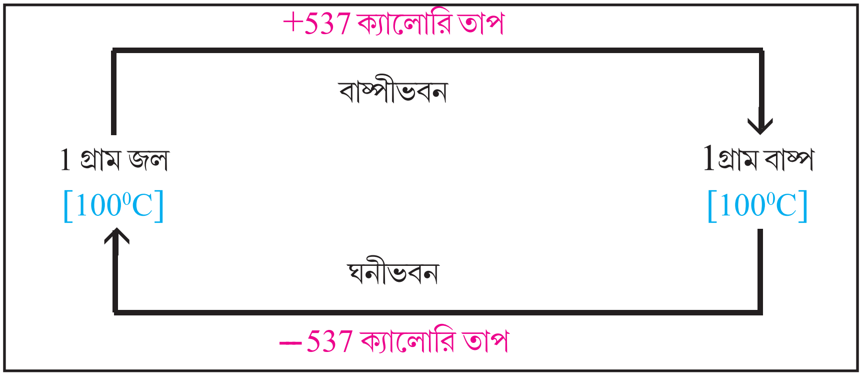

হাতে স্পিরিট বা ইথার ঢাললে ওই জায়গাটায় ঠান্ডা অনুভূত হয়। আসলে, স্পিরিট বা ইথার উদবায়ী পদার্থ (এই ধরনের পদার্থের খুব তাড়াতাড়ি বাষ্পীভবন হয়)। বাষ্পীভবনের জন্য দরকার লীন তাপ। স্পিরিট ওই লীন তাপ কোথা থেকে নেবে? স্পিরিট তখন আশপাশের পরিবেশ ও হাত থেকেই সেই লীন তাপ সংগ্রহ করে। ফলে হাতের ওই অংশ তখন তাপ হারায়। তখন পাশাপাশি অঞ্চলের তুলনায় ওই অংশের উষ্ণতা কমে যায়। ফলে ওই অংশে ঠান্ডার অনুভূতি হয়।

মাটির কলশির জল ঠান্ডা থাকে। আসলে, মাটির কলশির গায়ে অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ছিদ্র থাকে। ওই ছিদ্রগুলো দিয়ে সামান্য পরিমাণ জল কলশির বাইরে বেরিয়ে আসে। তখন তার বাষ্পীভবন ঘটে। ফলে দরকার হয় লীন তাপের। ওই বেরিয়ে আসা জল তখন কলশি এবং কলশির ভেতরে থাকা জল থেকে প্রয়োজনীয় লীন তাপ সংগ্রহ করে। ফলে কলশি ও কলশির জল তাপ হারিয়ে ঠান্ডা হয়ে পড়ে।

এখন দেখো তো তুমি নীচের ঘটনাগুলোর ব্যাখ্যা করতে পারো কিনা।

স্নান করে ওঠার পর পাখা চালিয়ে তার নীচে দাঁড়ালে ঠান্ডা বোধ হয়।

জল দিয়ে ঘর মোছার পর মেঝে ঠান্ডা হয়।

গরমকালে ঘরের জানালা-দরজা খোলা রেখে ভেজা পরদা টাঙানো হলে ঘর বেশ ঠান্ডা থাকে।

জীবের শারীরবৃত্তীয় ক্রিয়ায় তাপের ভূমিকা

জীবের আকৃতি, প্রকৃতি ও জীবনযাত্রার তারতম্যের পিছনে তাপ ও উষ্ণতার প্রভাব আছে। শীতপ্রধান অঞ্চলের প্রাণী গ্রীষ্মপ্রধান এলাকার ওইসব প্রাণীর তুলনায় বেশি লোমশ (যেমন — কুকুর)। গরমের দিনে মানুষের গা থেকে দরদর করে ঘাম পড়ে। কুকুরের জিভ থেকে লালা পড়ে। সবই দেহকে ঠান্ডা রাখার জন্য। আবার মেরু ভালুকের দেহে ঘন লোম বা পেঙ্গুইনদের গা জড়াজড়ি করে থাকা সবই শরীরকে গরম রাখার জন্য। খুব গরমে চারাগাছ শুকিয়ে যায়। আবার গরম বালিতে গিরগিটি, সাপের মতো ঠান্ডা রক্তের প্রাণীরা রোদ পোহায়। এসব ঘটনা তাপের প্রভাবেই ঘটে।

কোনো জীব কতটা তাপ দেহের ভেতরে তৈরি করতে পারে এবং বাইরের পরিবেশের সঙ্গে ওই জীবের কতটা পরিমাণ তাপের আদান-প্রদান হয়, তার ভিত্তিতেই বিভিন্ন জীবের দেহে তাপের তারতম্য হয়।

দেহের তাপমাত্রা বা উষ্ণতা বেড়ে গেলে এসো দেখি মানুষ কী কী করে —

1. .... বাড়িয়ে দেয়। 2. .... হার বেড়ে যায়। 3. .... ব্যাস বেড়ে যায়। 4. ....পরিমাণ কমে যায়। 5. .... অনীহা ও কুঁড়েমি দেখা যায়।

নীচের শব্দভাণ্ডার থেকে ওপরের শূন্যস্থানগুলি পূরণ করো।

শব্দভাণ্ডার: শ্বাসক্রিয়া, খাদ্যগ্রহণের,ঘাম বেরোনোর, কাজে, রক্তনালীর।

আবার দেহের তাপমাত্রা বা উষ্ণতা কমে গেলে মানুষের শরীরে কী কী ঘটে তা নীচের শব্দভাণ্ডারের সাহায্যে লেখো।

শব্দভাণ্ডার: কাঁপুনি, খাদ্যগ্রহণ, ঘাম বেরোনোর, লোম।

1. ...., 2. ...., 3. ...., 4. ....।

বাবলা, আমরুল, শুশনি ও রাধাচূড়ার মতো কিছু গাছের পাতা দিনের বেলায় একটা নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় খুলে যায়। আবার রাত হলে মুড়ে যায়। আবার বহু ফুলের পাপড়ি পরিবেশের তাপমাত্রা বেড়ে গেলে খুলে যায়।

তোমার চারদিকে জীবজগতের ওপর তাপের প্রভাবের কয়েকটি ঘটনা নিয়ে নিজেদের মধ্যে আলোচনা করো ও নীচের খোপে লেখো।

আলো

প্রাত্যহিক জীবনে আলো সংক্রান্ত বিভিন্ন ঘটনা ও আলোর সরলরৈখিক গতি

- জানালা থেকে একটু দূরে উজ্জ্বল রোদে ঘরের মধ্যে তুমি পড়তে বসেছ। এমন সময় তোমার মা জানালার পাশে এসে দাঁড়ালেন। ব্যাস, উজ্জ্বল রোদের বদলে একটা ছায়া এসে হাজির। এখন সব আবছা আবছা হয়ে গেল।
- অনিরুদ্ধ দুপুরবেলা ঝিলপাড়ে বটগাছের তলায় বসেছিল। তন্ময় হয়ে দেখছিল জলে ঢেউ-এর খেলা। কিন্তু হঠাৎই চোখ যেন আলোয় ধাঁধিয়ে উঠছিল। তখন ঢেউগুলোকে চকচকে লাগছিল।
- আনোয়ারা খালি বালতিটা যখন জল দিয়ে ভরতি করল তখন হঠাৎই বালতিটার উপর থেকে দেখে ও অবাক হয়ে গেল। বালতির গভীরতা যেন কমে গেছে মনে হচ্ছে।
- সুজাতা একদিন দুপুরবেলা বিছানায় শুয়ে ছিল। ঘুম আসছিল না। হঠাৎই দেখতে পেল ভেন্টিলেটর দিয়ে সূর্যের আলো উলটো দিকের দেয়ালে পড়ে কতগুলো গোল গোল আলোর চাকতি তৈরি করেছে। কিন্তু ওইরকম গোল গোল আকৃতি কেন?
- পুকুরের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় প্রত্যুষ প্রতিদিন দেখে পুকুরে গাছের আর পুকুর পাড়ের বাড়িগুলোর কেমন সুন্দর ছবি পড়ে। পুকুরটা ঠিক যেন একটা আয়না।
- আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে সুমি ভাবে ও যখন ওর ডান হাত নাড়ে তখন আয়নায় ওর ছবিটা একই রকমভাবে তার বাঁ-হাত নাড়ে কেন?
- একটা সোজা লাঠিকে লম্বভাবে মাটিতে পুঁতে রেখেছিল মৃণ্ময়। প্রতিদিন ওটার ওপর রোদ পড়ে। মৃণ্ময় প্রতিদিন ওর ছায়াটা লক্ষ করে। ছায়াটা কখনও ছোটো হয় কখনও বা বড়ো। কিন্তু মৃণ্ময় অবাক হয়ে দেখে, সূর্য যখন মাথার ঠিক উপরে, তখন লাঠির প্রায় কোনো ছায়াই পড়ে না।
- অরুণিমা একদিন জলভরতি বালতির মধ্যে একটা লাঠি ডুবিয়ে দেখে যে লাঠিটা যেন বাঁকা। কিন্তু যেই না লাঠিটাকে জলের ওপরে তুলল অমনি ওটা আবার সোজা হয়ে গেল।

এরকম কত ঘটনাই আমরা দেখি প্রতিদিন আমাদের চারপাশে। এসবই আলোর খেলা। আলো সম্বন্ধে জানলে, এসব ঘটনা কেন ঘটে তা বোঝা যায়। আমরা এখন সেটাই করব— জানব আলোর নানা কথা।

দিনেরবেলা আমরা ঘরের ভিতর সব কিছু দেখতে পাই—খাট, আলমারি, চেয়ার, টেবিল সব কিছু। আর যখন রাত্রি নেমে আসে, ঘরের ভিতরের আলো নিভে যায়, চাঁদের আলো বা রাস্তার আলো জানালা দিয়ে ঘরে ঢুকতে পারে না, তখন আমরা ঘরের ভিতরের কোনো জিনিসই দেখতে পাই না। আন্দাজে ঠাহর করে চলতে হয়। অথচ যদি একটা জোনাকি পোকা কোনোভাবে ঘরে ঢুকে পড়ে সেটাকে দেখতে আমাদের কোনো অসুবিধা হয় না।

এবার ভেবে বলো তো, জোনাকি পোকাটাকে তুমি দেখতে পেলে কেন?

অন্য জিনিসগুলোকে দিনেরবেলায় দেখতে পেলেও রাত্রিবেলায় অন্ধকারে দেখতে পাওনি কেন?

রাত্রিবেলাতেও যদি তুমি ওই জিনিসগুলোকে দেখতে চাও, তাহলে তোমার কী চাই?

তাহলে দেখা গেল কিছু কিছু বস্তু আছে যাদের নিজস্ব আলো আছে অর্থাৎ এই বস্তুগুলো থেকে নিজস্ব আলো নির্গত হয়। এই বস্তুগুলোকে **'স্বপ্রভ বস্তু'** বা **'আলোক উৎস'** বলে। যেমন - সূর্য, তারা, জোনাকি ইত্যাদি।

আবার যে বস্তুগুলোর নিজস্ব আলো নেই সেই বস্তুগুলোকে **'অপ্রভ বস্তু'** বলে। যেমন - ইট, কাঠ, পাথর ইত্যাদি।

নীচের সারণিটা পূরণ করো। ঠিক স্থানে '✓' দাও।

বস্তু	স্বপ্রভ	অপ্রভ
কেরোসিন লম্ফ		
পেন		
জামার বোতাম		
মোমবাতি (জ্বলন্ত)		
জোনাকি		
ছাতা		
তারা		
চশমা		
সূর্য		
চাঁদ		

আলোর উৎস যদি আকারে খুব ছোটো হয়, আমরা অনেক সময় তাকে বিন্দু-উৎস বলি। একটি টর্চের আলোর সামনে কালো কার্ডবোর্ড রেখে ওই বোর্ডের গায়ে পিন দিয়ে একটি ছিদ্র করা হলো। ওই ছিদ্র দিয়ে যখন টর্চের আলো বেরিয়ে আসছে তখন ছিদ্রটিকে বিন্দু আলোকউৎস বলে ভাবা যেতে পারে। তবে একথা ভুললে চলবে না যে জ্যামিতিতে আমরা বিন্দু বলতে যা বুঝি সেরকম অনেক বিন্দু মিলেই আসলে এইসব বিন্দু উৎসগুলো তৈরি। খুঁটিয়ে বিচার করলে তাই ওই কার্ডবোর্ডের ছিদ্র বিশুদ্ধ অর্থে বিন্দু-উৎস নয়।

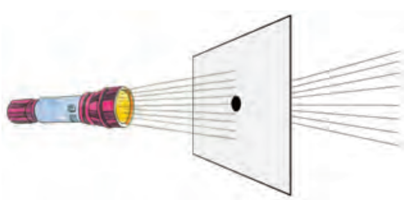

স্বপ্রভ বস্তু নিজে যেমন আলোর উৎস, তেমনি অপ্রভ বস্তুও আলোর উৎস হিসেবে আচরণ করতে পারে। কোনো স্বপ্রভ বস্তু থেকে আলো অপ্রভ বস্তুতে পড়লে ঠিকরে বেরোয়। যেমন স্টিলের বাসন একটি অপ্রভ বস্তু, কিন্তু তাতে সূর্যের আলো পড়ে সেই আলো ঠিকরে দেয়ালে যখন পড়ে তখন স্টিলের বাসনটিই আলোর উৎসের মতো আচরণ করে।

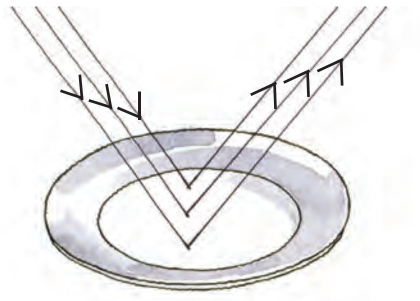

'বিন্দু আলোক উৎসের' চেয়ে আকারে বড়ো আলোক উৎসকে **'বিস্তৃত আলোক উৎস'** বলে। যেমন - টর্চ, সূর্য, বৈদ্যুতিক বালব ইত্যাদি।

কাচের জানালা বন্ধ করে রাখলেও বাইরের রোদ তা দিয়ে ঘরে ঢোকে। কিন্তু কাঠের জানালায় তো তা হয় না। আলো সবরকম পদার্থের মধ্যে দিয়ে যেতে পারে না। ভেবে দেখত, জলের মধ্যে দিয়ে কি আলো যেতে পারে? তুমি কি জল ভরতি পাত্রের তলদেশ বাইরে থেকে দেখতে পাও?

বায়ু,স্বচ্ছ কাচ, জল ইত্যাদি বস্তুগুলোকে **'স্বচ্ছ বস্তু'** বা **'স্বচ্ছ মাধ্যম'** বলে। এধরনের বস্তুর মধ্যে দিয়ে আলো সহজেই যাতায়াত করতে পারে। আবার, কাঠ, দেয়াল, লোহা ইত্যাদি যেসব বস্তুর মধ্যে দিয়ে আলো একেবারেই চলাচল করতে পারে না, তাদের **'অস্বচ্ছ বস্তু'** বা **'অস্বচ্ছ মাধ্যম'** বলে।

জানালা বন্ধ রয়েছে। জানালায় ঘষা কাচ লাগানো। জানালার বাইরে কে যেন দাঁড়িয়ে আছে। আবছা একটা মূর্তি। ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। জানালা বন্ধ অবস্থায় যখন ওই কাচ দিয়ে ঘরে রোদ আসে, তখন হালকা, ফিকে হওয়া রোদ আসে। আসলে ঘষা কাচ, কুয়াশা, ট্রেসিং পেপার ইত্যাদি বস্তুর মধ্যে দিয়ে আলো যাতায়াত করতে পারলেও, ভালোভাবে পারে না। তাই এই সমস্ত বস্তু বা মাধ্যমকে বলে **'ঈষৎ স্বচ্ছ বস্তু' বা 'ঈষৎ স্বচ্ছ মাধ্যম'।**

দরকারি কথা

কোনো মাধ্যম ছাড়াও আলো চলাচল করতে পারে। সূর্য ও পৃথিবীর মধ্যে এক বিরাট অংশে কোনো মাধ্যম থাকে না। তবু প্রতিদিন সূর্য থেকে আলো পৃথিবীতে এসে পৌঁছোয়।

আলোর সরলরৈখিক গতি

হাতেকলমে 1

একটা শক্ত ও সোজা দু-মুখ খোলা পাইপ নাও।

এবার এক চোখ বন্ধ করে পাইপটার মধ্য দিয়ে একটা জ্বলন্ত মোমবাতির শিখাকে দেখার চেষ্টা করো।

এবার একটা বাঁকা পাইপ নাও। পাইপটার মধ্য দিয়ে আগের মতো করেই শিখাটাকে দেখার চেষ্টা করো।

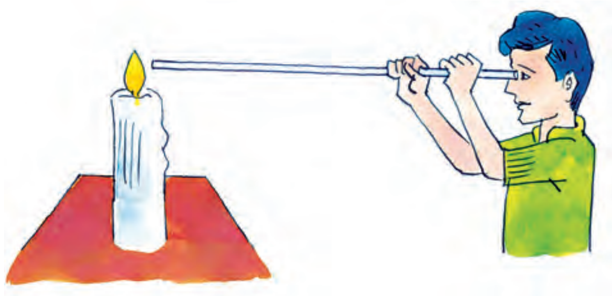

বাঁকানো পাইপের মধ্য দিয়ে মোমবাতির শিখাটাকে আর দেখতে পাচ্ছ কি? কেন এমন হলো ভাবত।

কোনো বস্তুকে দেখতে হলে ওই বস্তু থেকে আলো এসে আমাদের চোখে পড়তে হবে। তবেই সেই বস্তুকে দেখা সম্ভব।

প্রথম ক্ষেত্রে সেটাই হয়েছে।

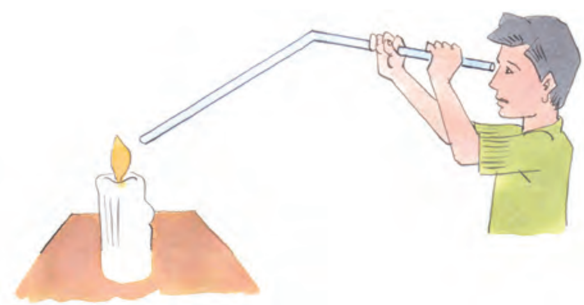

তাহলে, দ্বিতীয় ক্ষেত্রে কি মোমবাতির শিখা থেকে আসা আলো তোমার চোখ অবধি পৌঁছোতে পারেনি?

কেন পারল না? আলো কি তবে আসার পথে কোথাও বাধা পেয়েছে? কেনই বা বাধা পেল?

প্রথম ও দ্বিতীয় ক্ষেত্রের আলোর যাত্রাপথের মধ্যে পার্থক্য কোথায়?

পাইপটা সোজা থাকায় আলো প্রথম ক্ষেত্রে শিখা থেকে চোখে পৌঁছোতে পেরেছে, দ্বিতীয় ক্ষেত্রে পাইপটা ছিল বাঁকা। আর তাই দ্বিতীয় ক্ষেত্রে আলো চোখে এসে পৌঁছোতে পারেনি।

তাহলে বলা যায় ঃ

আলো সরলরেখায় চলাচল করে। এটা আলোর একটা ধর্ম।

আলোর আচার-আচরণকে বুঝতে আমরা জ্যামিতির চিত্রের সাহায্য নিই। আলোর যাত্রাপথকে ওই চিত্রে তির চিহ্ন যুক্ত সরলরেখার সাহায্যে বোঝানো হয়।

আলোর চলার পথকে তির চিহ্ন যুক্ত যে কাল্পনিক সরলরেখা দিয়ে বোঝানো হয়, তাকে **'আলোক রশ্মি'** (Ray of light) বলে। একটি আলোকরশ্মি বলে বাস্তবে কিছু নেই।

একসঙ্গে অসংখ্য আলোক রশ্মিকে, **'আলোক রশ্মিগুচ্ছ'** **(Beam of light)** বলে।

আলোক রশ্মিগুচ্ছ তিন ধরনের হয়।

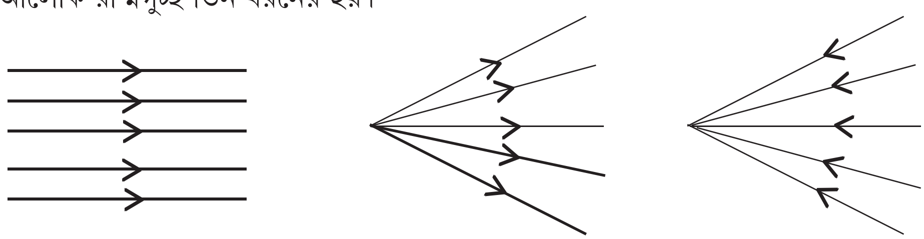

সমান্তরাল আলোক রশ্মিগুচ্ছ **অপসারী আলোক রশ্মিগুচ্ছ** **অভিসারী আলোক রশ্মিগুচ্ছ**

প্রচ্ছায়া ও উপচ্ছায়া

সন্ধ্যা নেমে এসেছে। তোমার ঘরে টিউবলাইট (অথবা আলোর অন্য কোনো উৎস) জ্বলছে। তুমি লাইটটার ঠিক উলটো দিকের দেয়ালের কাছে তোমার হাত রাখলে। সঙ্গে সঙ্গে দেয়ালে তোমার হাতের তালুর আকৃতি একটা অন্ধকার জায়গা গঠিত হলো। তোমার হাতের তুলনায় আকৃতিটা একটু বড়ো। ভালোভাবে লক্ষ করে দেখলে দেখা যায়, ওই অন্ধকার আকৃতির মাঝখানের অংশ বেশ **গাঢ়**। আর ওই গাঢ় অন্ধকার অংশকে ঘিরে রয়েছে একটা আবছা অন্ধকার অংশ।

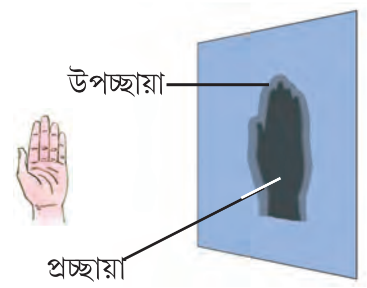

ওই গাঢ় অন্ধকার অংশটা হলো **ছায়া বা প্রচ্ছায়া**। আর প্রচ্ছায়াকে ঘিরে থাকা আবছা অন্ধকার অংশটা হলো **উপচ্ছায়া**।

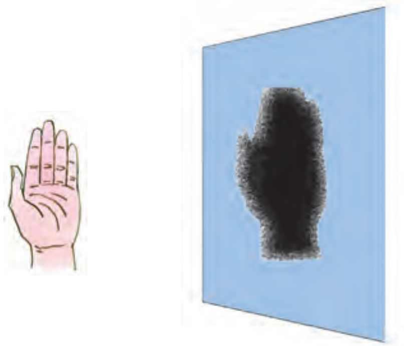

তুমি হাতটা যত দেয়ালের কাছে নিচ্ছ, দেখবে ছায়া তত ছোটো হচ্ছে। আর উপচ্ছায়াও কমছে। যখন হাত দেয়ালের খুব কাছে, তখন উপচ্ছায়া একেবারেই নেই। শুধুই প্রচ্ছায়া।

আবার হাত যত দেয়াল থেকে দূরে সরিয়ে নিচ্ছ, তুমি দেখবে ছায়ার অংশটা ক্রমেই ছোটো হচ্ছে আর উপচ্ছায়া ক্রমেই বড়ো হচ্ছে।

এবার টিউবলাইটটা নিভিয়ে দাও। বন্ধুকে বলো একটা ছোট্ট মোমবাতি জ্বালিয়ে তোমার হাতের পেছনে ধরতে (ছবিতে দেখো)।

(একটা কালো পিচবোর্ডের মাঝে পেরেক দিয়ে ফুটো করে মোমবাতির আলো ওই ফুটো দিয়ে পাঠাতে পারলে পরীক্ষাটা আরো ভালো হবে।)

কী দেখতে পেলে? দেয়ালে শুধুই তোমার হাতের ছায়া। উপচ্ছায়া অনুপস্থিত।

তাহলে দেখা যাচ্ছে, আলোক উৎস বড়ো হলে প্রচ্ছায়া আর উপচ্ছায়া দুটোই গঠিত হয়। আবার উৎস যদি বিন্দু উৎস বা ছোটো উৎস হয় তখন উপচ্ছায়া গঠিত হয় না। শুধুই ছায়া গঠিত হয়।

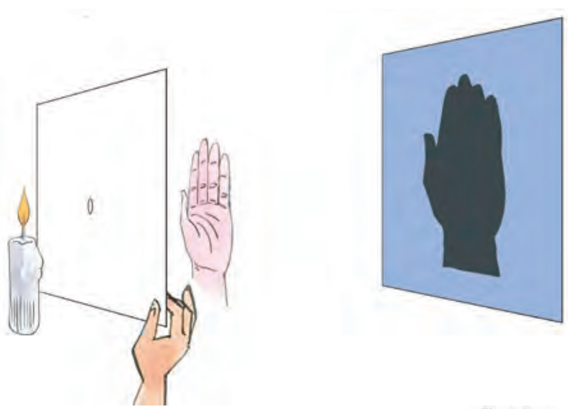

এবার হাতকে মোমবাতির কাছে নিয়ে যাও। কী দেখতে পাচ্ছ? ছায়া ক্রমশ বড়ো হতে থাকছে। হাত আবার আগের স্থানে নিয়ে এসো।

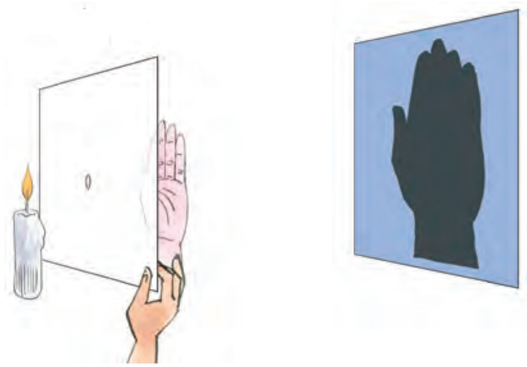

এবার, হাতকে দেয়ালের কাছে নিয়ে যেতে থাকো। কী দেখছ? ছায়া ক্রমশ ছোটো হচ্ছে। দেয়ালে স্পর্শ করার ঠিক আগের মুহূর্তে ছায়ার দৈর্ঘ্য ও হাতের দৈর্ঘ্য সমান হয়ে গেল।

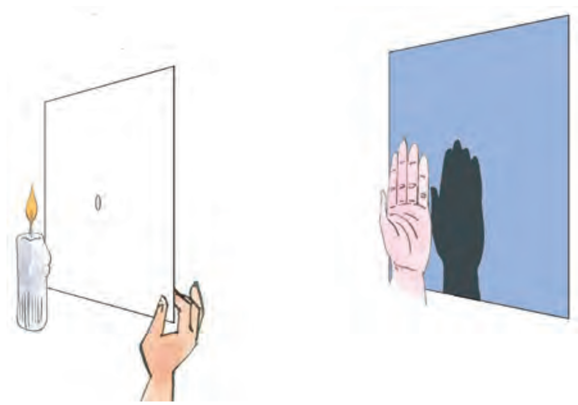

এবার মোমবাতিটা হাতের কাছ থেকে দূরে সরাতে থাকো। কী দেখতে পেলে? ছায়া ক্রমেই ছোটো হতে থাকছে। মোমবাতিকে আবার আগের স্থানে নিয়ে এসো।

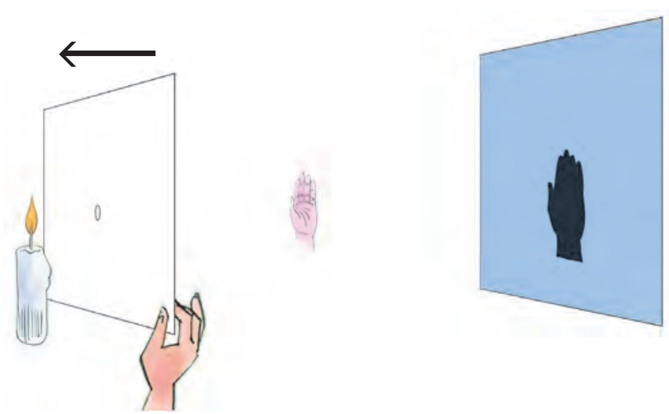

এখন, মোমবাতিটাকে হাতের কাছে আনতে থাকো। কী লক্ষ করছ? ছায়া ক্রমশ বড়ো হচ্ছে।

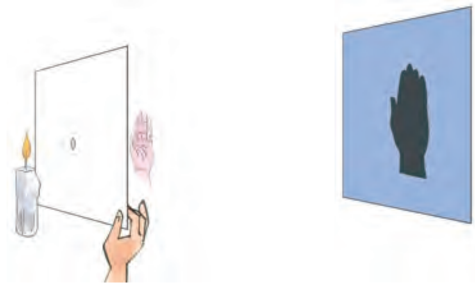

পরীক্ষাটা এবার ঘরের মাঝখানটায় করো। মোমবাতিটাকে টেবিলের কিনারায় বসাও। তার সামনে হাতটা ধরো। এবার বন্ধুকে বলো একটা বড়ো ক্যালেন্ডার উলটোপিঠ করে তোমার হাতের পিছনে একটু দূরে ধরতে। সঙ্গে সঙ্গে ওই ক্যালেন্ডারের ওপরে তোমার হাতের ছায়া গঠিত হবে। (চিত্র -1)

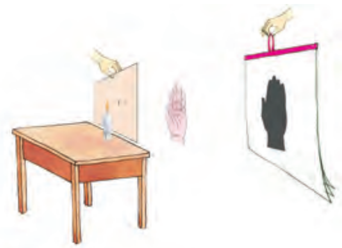

চিত্র -1

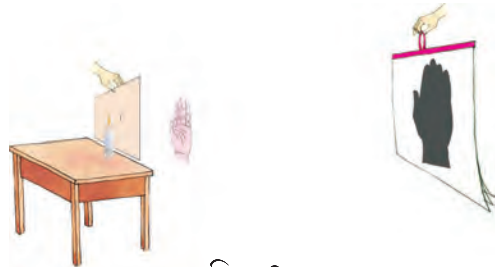

চিত্র -2

এবার, ক্যালেন্ডারটা হাতের কাছ থেকে দূরে সরাতে থাকো। কী দেখছ? ছায়াটা ক্রমশ বড়ো হচ্ছে। (চিত্র -2) ক্যালেন্ডার আগের স্থানে নিয়ে এসো।

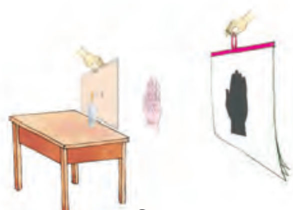

চিত্র -3

এখন ক্যালেন্ডারটা হাতের দিকে এগিয়ে আনতে থাকো। এবার দেখতে পাবে ছায়া ক্রমশ ছোটো হচ্ছে। (চিত্র -3) ক্যালেন্ডার হাতকে স্পর্শ করার ঠিক আগের মুহূর্তে হাতের দৈর্ঘ্য ও ছায়ার দৈর্ঘ্য সমান হয়ে যাবে। (চিত্র -4)

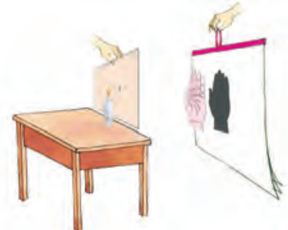

চিত্র -4

তোমরা জেনেছ আলো সরলরেখায় গমন করে। তাই আলোর চলার পথে কোনো অস্বচ্ছ বস্তু ধরলে, আলো বাধা পায়। আর সামনে এগোতে পারে না। কিন্তু বাধা না পাওয়া আলো সরলরেখা ধরে সামনে এগিয়ে যায়। ফলে বস্তুটার পেছনে কোনো পর্দা ধরলে তাতে বস্তুটার আকৃতিবিশিষ্ট অন্ধকার অংশ গঠিত হয়।

তাহলে দেখা গেল আলো সরলরেখায় গমন করে বলেই বস্তুর **'ছায়া'** বা **'প্রচ্ছায়া'** গঠিত হয়।

বিস্তৃত আলোক উৎসের ক্ষেত্রে গঠিত হয় উপচ্ছায়া। এক্ষেত্রেও আলোর সরলরৈখিক গতিই দায়ী। আসলে, উপচ্ছায়া অংশে আলোক উৎসের কিছু অংশ থেকে আলো প্রবেশ করার সুযোগ পায়। তাই সেখানে অন্ধকার গাঢ় হতে পারে না।

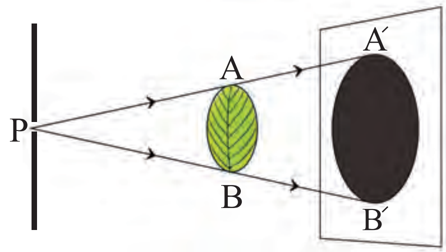

ছবিতে দেখো AB অস্বচ্ছ বস্তু। P -বিন্দু উৎস থেকে আসা আলোকরশ্মিগুচ্ছ AB-র ধার ঘেঁসে PAA′ ও PBB′ পথে পর্দায় গিয়ে পড়েছে। APB ফানেল আকৃতির অংশের কোনো আলোকরশ্মিই পর্দায় পৌঁছোতে পারেনি। কারণ তারা AB- অস্বচ্ছ বস্তুতে বাধা পাচ্ছে। বাকি আলোক রশ্মিগুচ্ছ পর্দায় পৌঁছোতে কোনো বাধা পায়নি। ফলে তারা পর্দাকে আলোকিত করতে পেরেছে। ফলে পর্দার যে অংশ (A′B′) কোনো আলো পেল না তা অন্ধকার হয়ে গেছে। এই অংশটা হলো বস্তুর ছায়া বা প্রচ্ছায়া।

এবার এসো একটা বিস্তৃত আলোক উৎস নেওয়া যাক।

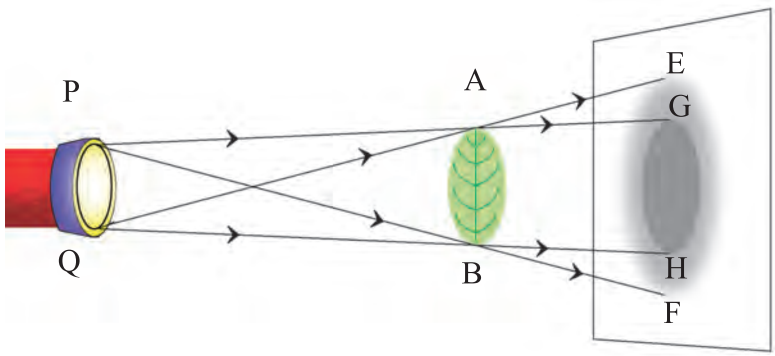

PQ বিস্তৃত আলোক উৎস। এই আলোক উৎসকে অসংখ্য বিন্দু আলোক উৎসের সমষ্টি ধরা যেতে পারে।

P বিন্দু থেকে আসা APB ফানেল আকৃতির অংশের আলোক রশ্মিগুচ্ছের কোনো অংশই পর্দায় পৌঁছোতে পারেনি। কারণ তারা AB অস্বচ্ছ বস্তুতে বাধা পেয়েছে। তাই GF অংশে ছায়া সৃষ্টি হয়েছে। আবার একইরকম ভাবে Q বিন্দু থেকে আসা AQB ফানেল আকৃতির অংশের আলোকরশ্মিগুচ্ছের কোনো অংশই পর্দায় পৌঁছোতে পারেনি। কারণ AB -তে তারা বাধা পায়। ফলে EH অংশে অন্ধকার গঠিত হয়েছে।

কিন্তু GH অংশে PQ আলোক উৎসের থেকে আসা কোনো আলোক রশ্মিই পৌঁছোতে পারেনি। তাই ওই অংশে গাঢ় ছায়া তৈরি হয়েছে। আবার GE অংশে, আলোক উৎসের নীচের দিক থেকে কোনো আলোই পর্দায় পৌঁছোতে পারেনি। কিন্তু ওপরের অংশ থেকে আলো পৌঁছোতে পেরেছে। তাই GE অংশের অন্ধকার গাঢ় হতে পারেনি। একই ঘটনা ঘটে FH অংশে। FH অংশে, আলোক উৎসের ওপরের অংশ থেকে কোনো আলো এসে পর্দায় পৌঁছোতে পারেনি। কিন্তু নীচের অংশ থেকে আলো ওই অংশে আসতে পেরেছে। ফলে FH অংশও গাঢ় অন্ধকার হতে পারেনি।

তাই GE ও FH অংশে গঠিত হয়েছে উপচ্ছায়া। আর GH অংশে গঠিত হয়েছে প্রচ্ছায়া বা ছায়া।

সূচিছিদ্র ক্যামেরা

হাতেকলমে 2

ঘরের দেয়ালের কাছে একটা টেবিল নাও। ওই টেবিলের উপর একটা জ্বলন্ত মোমবাতি বসাও। একটা কার্ডবোর্ড নাও। একটা সরু পেরেক দিয়ে বোর্ডটার মাঝখানে একটা ছিদ্র করো। ঘর অন্ধকার করে দাও, মোমবাতির শিখা ও দেয়ালের মাঝে কার্ডবোর্ডটিকে ধরো। খেয়াল রাখো যেন কার্ডবোর্ডের ছিদ্রটা ও মোমবাতির শিখা একই উচ্চতায় থাকে।

এবার সামনের দেয়ালটা লক্ষ করো।

কী দেখতে পাচ্ছ?

দেয়ালে উলটানো মোমবাতির শিখার ছবি কী করে গঠিত হলো?

মোমবাতির শিখা থেকে চারদিকে আলো ছড়াচ্ছে। কিন্তু সব আলোকরশ্মি কার্ডবোর্ডের ছিদ্রটি দিয়ে যাচ্ছে না। P-ছিদ্রের মধ্য দিয়ে মোমবাতির শিখার নীচের দিকের A বিন্দু থেকে আসা আলোকরশ্মি AA' পথে দেয়ালের উপর A' বিন্দুতে পৌঁছোয়। একইভাবে শিখার ওপরের দিকের B বিন্দু থেকে আসা আলোকরশ্মি BB' পথে দেয়ালের উপর B' বিন্দুতে পৌঁছোয়। একইভাবে শিখার অন্যান্য বিন্দু থেকে আসা একটি করে রশ্মি ছিদ্র P-দিয়ে গিয়ে দেয়ালে পৌঁছোয়। ফলে দেয়ালের উপর AB শিখার উলটানো প্রতিকৃতি B'A' পাওয়া যায়। আলো সরলরেখায় চলাচল করে বলেই এটা হয়।

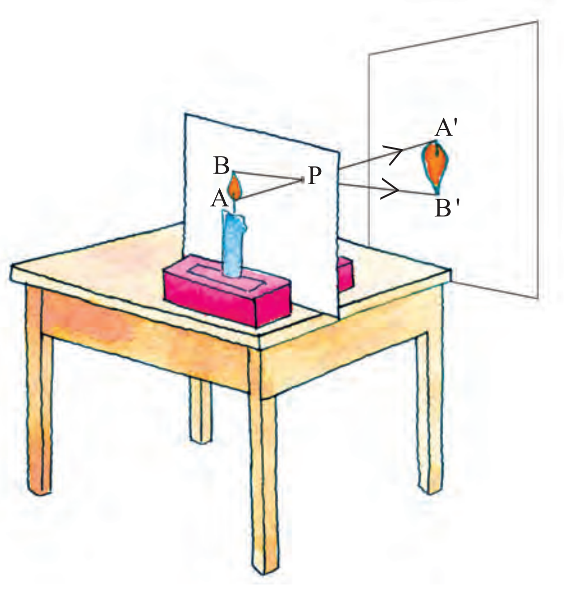

জুতোর বাক্সের মতো বড়ো একটি বাক্স নাও। ছবিতে যেমন দেখানো হয়েছে তেমনভাবে বাক্সটির একদিকের দেয়ালে সুচ বা সরু পেরেক দিয়ে একটি ছোট্ট ফুটো করো। বাক্সের ঠিক উলটো দিকের দেয়ালটি কেটে বাদ দিয়ে

সেখানে ট্রেসিং পেপার বা ঘষা কাচ দিয়ে একটি দেয়াল বানাও। এবার অন্ধকার ঘরে গিয়ে বাক্সের দেয়ালের ওই ফুটোর কাছে একটি মোমবাতির শিখা ধরো। দেখত উলটোদিকের ট্রেসিং পেপার বা ঘষা কাচের দেয়ালে মোমবাতির শিখার উলটানো প্রতিকৃতি দেখতে পাও কিনা। এই বাক্সটিই হলো তোমার সূচিছিদ্র ক্যামেরা। আগের পরীক্ষায় নেওয়া ছিদ্রসহ কার্ডবোর্ড ও দেয়াল মিলে একসঙ্গে ওই ক্যামেরা তৈরি হয়েছিল। আগের পরীক্ষায় তুমি মোমবাতি, কার্ডবোর্ড সরিয়ে ভালোভাবে লক্ষ করো। শিখাকে ছিদ্র থেকে যত দূরে সরাবে প্রতিকৃতি তত ছোটো হবে।

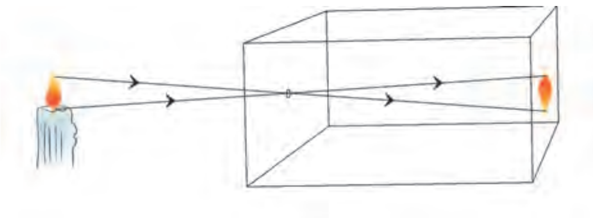

শিখাকে ছিদ্রের যত কাছে আনবে, প্রতিকৃতি তত বড়ো হবে।

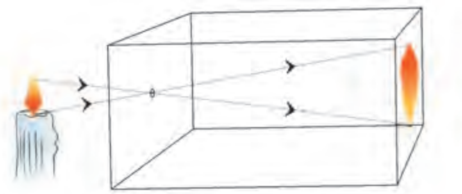

শিখা ও ছিদ্রের দূরত্ব অপরিবর্তিত রেখে, ছিদ্র থেকে পর্দার দূরত্ব (অর্থাৎ ক্যামেরার দৈর্ঘ্য) যত বাড়ানো হবে প্রতিকৃতি তত বড়ো হবে।

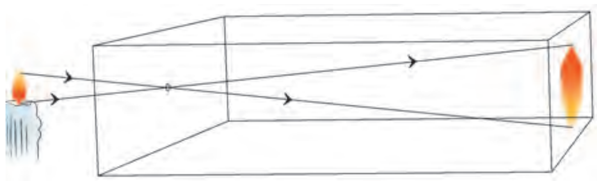

যদি ছিদ্র ও পর্দার দূরত্ব কমে, তবে প্রতিকৃতি ছোটো হয়ে যাবে।

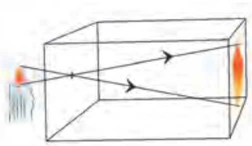

ছিদ্রকে বড়ো করে দেখো তো প্রতিকৃতির কিছু পরিবর্তন হয় কিনা?

আসলে, ছিদ্র বড়ো হলে তা অসংখ্য ছোটো ছোটো ছিদ্রের সমষ্টিরূপেই কাজ করে। প্রতিটি সূক্ষ্ম ছিদ্র একএকটি আলাদা আলাদা স্পষ্ট প্রতিকৃতি তৈরি করে। ফলে সমস্ত প্রতিকৃতি মিলেমিশে একটা অস্পষ্ট প্রতিকৃতি তৈরি হয়।

স্বাভাবিকভাবেই ছিদ্র যত ছোটো হবে, প্রতিকৃতি তত সূক্ষ্ম হবে।

সূচিছিদ্র ক্যামেরায় বস্তুর **প্রতিকৃতি** গঠিত হয় মাত্র, তা মোটেই **প্রতিবিম্ব** নয়। এই ক্যামেরায় ফিলম লাগিয়ে ছবি তুলতে অনেক সময় লাগে, কারণ অনেকক্ষণ আলোকে ভিতরে প্রবেশ করাতে হয়।

তোমরা নিশ্চয়ই খেয়াল করেছ, বড়ো গাছের পাতার ফাঁক দিয়ে সূর্যের আলো প্রবেশ করে মাটিতে গোল গোল অসংখ্য আলোর পটি তৈরি করে। ওগুলো আসলে সূর্যের প্রতিকৃতি বা ছবি।

কোন ক্যামেরায় সূর্যের এই ছবি উঠল বলো তো?

জানালা বা ভেন্টিলেটরের ফাঁক দিয়ে সূর্যের আলো প্রবেশ করে ঘরের মেঝেতে বা দেয়ালে ওইরকম গোল গোল সূর্যের প্রতিকৃতি তৈরি করে।

এখানে ক্যামেরা কোনটি বলো তো?

একটা লাঠিকে লম্বভাবে মাটিতে পুঁতে দাঁড় করিয়ে রাখো। সারাদিন লাঠির ছায়াটাকে লক্ষ রাখো। এবার নীচের প্রশ্ন দুটোর উত্তর দাও।

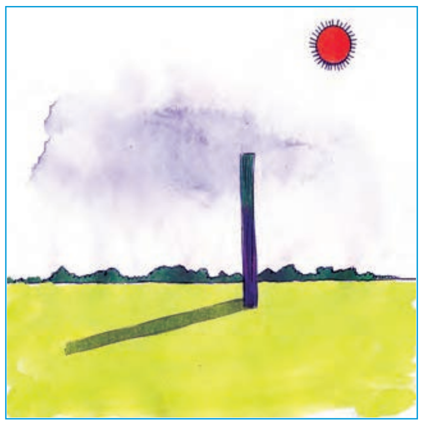

লাঠির ছায়ার দৈর্ঘ্য—

কখন সবচেয়ে ছোটো?

কখন সবচেয়ে বড়ো?

অন্ধকার ঘরে টেবিলের উপর একটা মোমবাতি জ্বালিয়ে রাখো। বাতিটার সামনে একটা থালা কীভাবে ধরলে দেয়ালে নীচের আকৃতির ছায়া পাবে?

1) সম্পূর্ণ বৃত্তাকার   2) লম্বাটে গোল   3) একটা সরু দণ্ডের মতো।

অন্ধকার ঘরে, একটা টর্চ বা মোমবাতি জ্বালাও। এবার তার সামনে তোমার দু-হাতের তালু ও আঙুল নানাভাবে ধরো। এখন সামনের দেয়ালে তার ছায়াটিকে লক্ষ করো।

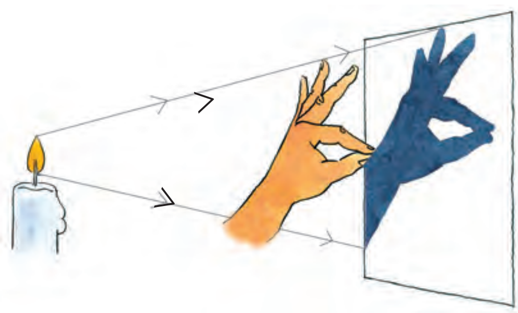

আলোর প্রতিফলন

হাতেকলমে 3

একটা ছোটো আয়না নাও। তোমার ঘরের ভিতর প্রবেশ করা উজ্জ্বল রোদের মধ্যে আয়নাটাকে ধরো। এবার আয়নাটাকে খুব ধীরে ধীরে সামান্য একটু এদিক-ওদিক করে ঘোরাও।

দেয়ালে কী দেখতে পাচ্ছ? ওই দেয়ালটাতে আলো এল কোত্থেকে?

আয়নাটা সামান্য নাড়ালে দেয়ালের ওই আলোও নড়ে ওঠে কেন?

তাহলে কি সূর্যের আলো ওই আয়নাতে পড়ে ফিরে গিয়ে দেয়ালে পৌঁছেছে?

আয়নাতে পড়ে আলোর এই যে ফিরে আসা, এই ঘটনাকে বলে আলোর প্রতিফলন (Reflection of light)।

চলো একটা পরীক্ষা করা যাক :

একটা সাদা শক্ত কাগজে একটা সরলরেখাংশ XY নাও (ছবিতে দেখো)। এখন ওই রেখাংশে একটা চাঁদা বসিয়ে 0° থেকে 180° পর্যন্ত চিহ্নিত করো এবং 60° কোণটি আঁকো। (ছবি দেখো)।

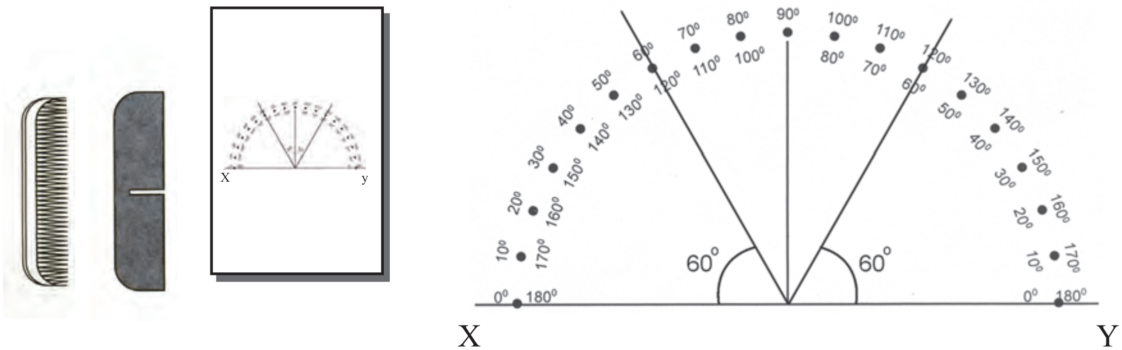

এবার কাগজটা টেবিলের ওপর পেতে দাও। একটা চিরুনি নাও, এবং ওই চিরুনির দাঁতগুলো কালো মোটা কাগজ দিয়ে এমনভাবে ঢেকে দাও যেন মাঝখানের একটামাত্র ফাঁক ঢাকা না পড়ে।

কাগজের উপর আঁকা সরলরেখা বরাবর একটা ছোট আয়না দাঁড় করাও। এমন একটি আয়না নিতে হবে যার চারদিকে কোনো ফ্রেম নেই।

এবার, চিরুনিটি কাগজের ওপর এমনভাবে দাঁড় করাও যাতে দাঁতগুলোর মাঝখানে ফাঁকা (না ঢাকা) জায়গাটি কোনো একটি কোণের (ধরি 60°) দাগের উপরে থাকে (ছবি দেখো)।

এবারে ঘর অন্ধকার করে সরু মুখওয়ালা টর্চটি জ্বালাও ও টর্চের আলো চিরুনির ওই ফাঁকা জায়গায় ফেলো। খেয়াল রাখো যাতে আলোর একটি রেখা চিরুনির ওপাশে আয়নার ওপর এমন জায়গায় পড়ে, যেখানে 90^0 চিহ্নিত রেখাটি আয়নাকে ছুঁয়েছে।

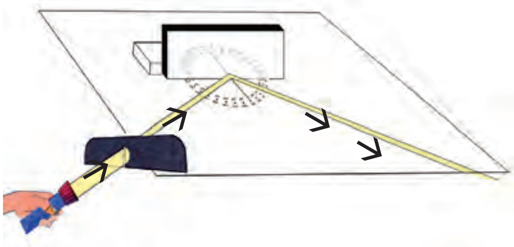

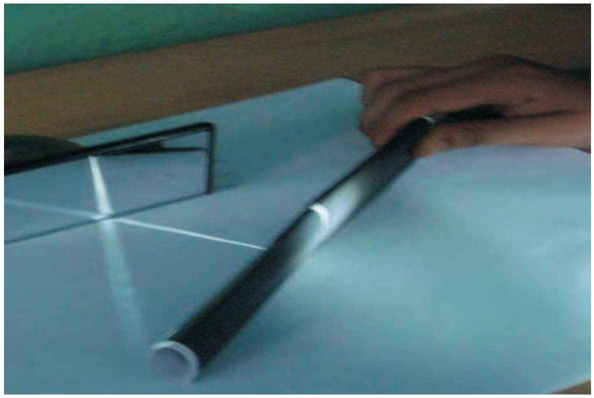

খেয়াল করে দেখো 60° (বা অন্য কোনো কোণ) করে আয়নায় পড়া আলো আয়না থেকে প্রতিফলিত হয়ে উলটো দিকের 60° (বা অন্য কোনো কোণ) চিহ্নিত দাগের ওপর দিয়েই যাচ্ছে।

টেবিলে পাতা কাগজটা যদি উঁচুনীচু থাকে তাহলে আলোর রেখা কাগজের উপরে ভালোভাবে দেখা যাবে না। তাই সতর্ক থাকবে, যেন টেবিলে পাতা কাগজের তলে ঢেউ খেলানো না থাকে।

এবার, কাগজের উপর থেকে সব কিছু সরিয়ে দাও। একটা স্কেল দিয়ে আলোর আসার ও যাওয়ার পথ সরলরেখাংশ দিয়ে চিহ্নিত করো।

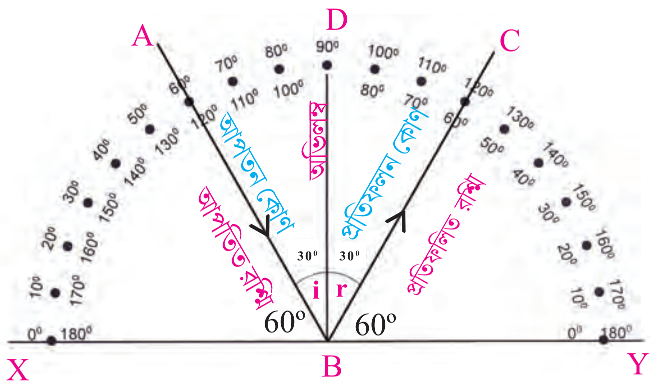

যে পথ ধরে আলো আয়নায় এসে পড়েছে তাকে **'আপতিত আলোকরশ্মি'** (Incident Ray) বলে (AB)।

আয়নায় পড়ে আলো যে পথ ধরে ফিরে যায় তাকে **'প্রতিফলিত আলোকরশ্মি'** (Reflected Ray) বলে (BC)।

আয়নার উপর যে বিন্দুতে আপতিত আলো এসে পড়েছে তাকে **আপতন বিন্দু** (Point of incidence) বলে (B)।

আয়নার অবস্থান যে সরলরেখাংশ দিয়ে চিহ্নিত করা হয়েছে (XY) তা **প্রতিফলক** (Reflector) বোঝাচ্ছে।

প্রতিফলকের উপর আপতন বিন্দুতে আঁকা লম্বকে (BD) **'অভিলম্ব'** (Normal) বলে।

অভিলম্ব ও আপতিত রশ্মির মাঝের কোণকে **'আপতন কোণ'** (Angle of incidence, $\angle ABD = \angle i$) বলে। (এক্ষেত্রে $\angle i = 30^{o}$)

অভিলম্ব ও প্রতিফলিত রশ্মির মাঝের কোণকে **'প্রতিফলন কোণ'** (Angle of reflection, ∠CBD =∠r) বলে।

এবার ভালো করে দেখো তো আপতন ও প্রতিফলন কোণের মান, কোনটা কত?

উ: আপতন কোণ = 30^o

প্রতিফলন কোণ = ——— ^{o} [ফাঁকা স্থান পূরণ করো]

তাহলে বলা যায় আপতন কোণ ও প্রতিফলন কোণের মান সমান হয়। — এটি প্রতিফলনের একটি নিয়ম।

এই পরীক্ষায় নিশ্চয়ই লক্ষ করেছ যে কাগজের তলের ওপরেই আপতিত ও প্রতিফলিত আলোর রেখা অবস্থান করছে। কাগজে ঢেউ খেলানো থাকলে বা কোথাও উঁচুনীচু থাকলে রেখাগুলি কাগজে ভালোভাবে পড়ছে না।

তাহলে বলা যায়, আপতিত রশ্মি, প্রতিফলিত রশ্মি ও প্রতিফলকের উপর আপতন বিন্দুতে আঁকা অভিলম্ব একই সমতলে থাকে। এটিও প্রতিফলনের অন্য একটি নিয়ম।

যখন মসৃণ তলে আলোর প্রতিফলন ঘটে তখন সেই প্রতিফলন হলো নিয়মিত প্রতিফলন (Regular Reflection of Light)। যেমন— আয়নায় প্রতিফলন, চকচকে স্টিলের মসৃণ বাটিতে প্রতিফলন।

সমতল দর্পণে নিয়মিত প্রতিফলনের সময় আপতিত আলোর রশ্মিগুচ্ছ একটি বিশেষ ধরনের হলে প্রতিফলনের পরেও সেই রশ্মিগুচ্ছ ওই বিশেষ ধরনেরই হয় যেমন, সমান্তরাল বা অভিসারী বা অপসারী।

ধরো, তুমি অপসারী রশ্মিগুচ্ছ পাঠালে। প্রতিফলনের পর তা আয়না থেকে অপসারী হয়েই ফিরবে যদি আয়নাটি সমতল হয়। কিন্তু যদি আয়নাটির তল বক্র হয় তাহলে অবশ্য প্রতিফলিত রশ্মিগুচ্ছ অপসারী না হয়ে সমান্তরাল বা অভিসারীও হতে পারে। প্রতিফলিত রশ্মিগুচ্ছের ধরন কেমন হবে তা নির্ভর করে আয়নাটির বক্রতা কেমন তার ওপর।

যখন অমসৃণ তলে আলোর প্রতিফলন ঘটে তখন সেই প্রতিফলনকে বিক্ষিপ্ত প্রতিফলন (Diffused Reflection of light) বলে। যেমন — গাছপালা, মাটি, ঘরের দেয়াল, সিনেমার পর্দা ইত্যাদির উপর আলোর প্রতিফলন।

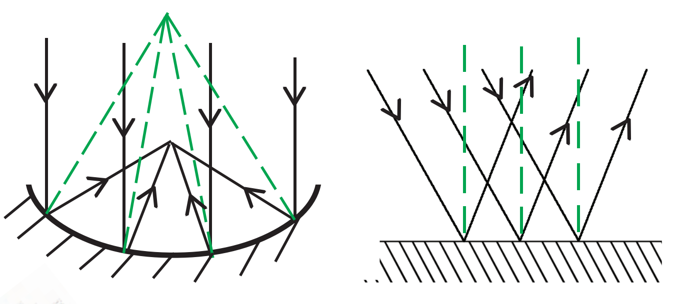

নিয়মিত প্রতিফলন

কোনো মসৃণ তলে প্রতিফলন সাধারণ ভাবে নিয়মিত প্রতিফলন। যেমন সমতল বা বক্রতল আয়নায় প্রতিফলন

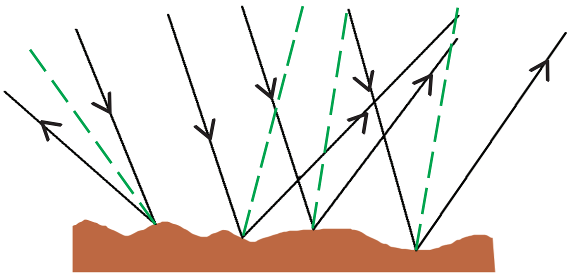

বিক্ষিপ্ত প্রতিফলন

এই প্রতিফলনে আপতিত রশ্মিগুচ্ছ সমান্তরাল হলেও প্রতিফলনের পর তারা আর সমান্তরাল থাকে না। বিক্ষিপ্তভাবে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে।

তবে দুই ক্ষেত্রেই প্রতিটি আলোকরশ্মি প্রতিফলনের দুটি সূত্রই মেনে চলে।

নিয়মিত ও বিক্ষিপ্ত প্রতিফলনের কয়েকটি উদাহরণ খাতায় লিখে ফেলো।

আলোর প্রতিসরণ

হাতেকলমে 4

একটা কাচের গ্লাসে কিছুটা জল নাও। ওপর থেকে জলের যে তল দেখতে পাচ্ছ তা বায়ু ও জলকে আলাদা করেছে। জলের এই তল হলো **বায়ু ও জলের বিভেদ তল**। এবার ওই গ্লাসের মধ্যে ধীরে ধীরে গা চুঁইয়ে অল্প নীল কেরোসিন তেল নাও।

এবার গ্লাসের পাশ থেকে জলের ভিতর দিয়ে ওপরের দিকে তাকাও। কী দেখতে পাচ্ছ?

যে নীলরঙের গোল তলটা দেখতে পাচ্ছ সেটা **'কেরোসিন ও জলের বিভেদতল'**।

জল যেখানে শেষ হয়েছে আর কেরোসিন যেখান থেকে শুরু হয়েছে অর্থাৎ দুই আলাদা আলাদা ঘনত্বের মাধ্যমের সংযোগস্থলে যে তল, তাকেই ওই মাধ্যম দুটোর '**বিভেদতল**' বলে।

হাতেকলমে 5

নীচের পরীক্ষাটি তোমরা দেখবে, নিজে হাতে করবে না। তোমাদের শিক্ষক বা শিক্ষিকা ক্লাসে করে দেখাবেন।

উপকরণ ঃ একটা কাচের ব্লক বা বুদবুদহীন নিরেট পেপারওয়েট বা কাচের ব্লক, একটা লেজার টর্চ, সাদা একটা পর্দা।

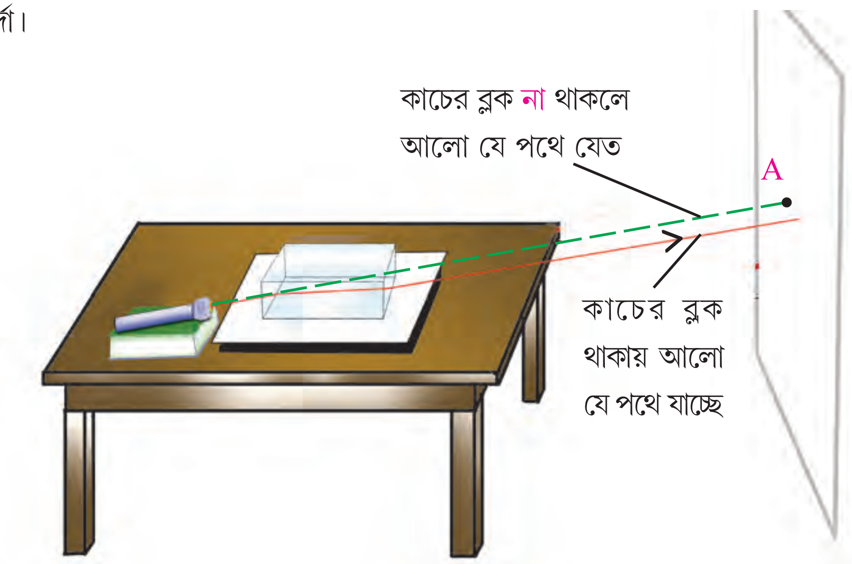

তোমাদের শিক্ষক/শিক্ষিকা লেজার টর্চটা জ্বালিয়ে দেয়ালের দিকে ধরলেন। ফলে দেয়ালে একটা আলোর বিন্দু তৈরি হলো। কিন্তু টর্চটা মাস্টারমশাই বা দিদিমণির হাতে থাকায় আলোক বিন্দুটা নড়ছে। তাই একটা টেবিলের ওপর টর্চটা রাখা হলো। এবার টর্চটা স্থির হলো। তাই আলোর বিন্দুটাও স্থির হলো। দেয়ালে বিন্দুটাকে 'A' লিখে চিহ্নিত করা হলো। এরপর কাচের ব্লক বা পেপারওয়েটটা ওই আলোর পথে ধরা হলো। আলো এবার কাচের মধ্যে দিয়ে গিয়ে দেয়ালে পড়েছে। এবার দেয়ালের দিকে তাকিয়ে দেখত আলোর বিন্দুটা দেয়ালে 'A' — চিহ্নিত জায়গাতেই পড়ল, না সরে গেল?

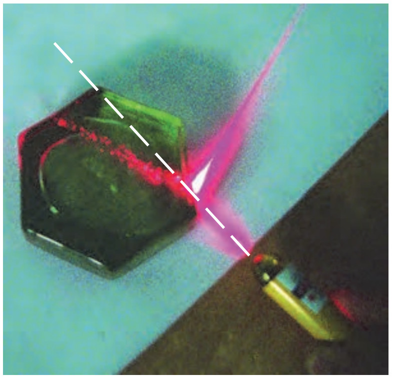

আলোক বিন্দুটা সরে গেল কেন? ভাবো।

তাহলে কি আলো তার গতিপথ পরিবর্তন করল? কেন করল? ভাবো।

এবার কাচের ব্লক বা পেপারওয়েট সরিয়ে দাও।

এবার কী দেখলে? আলোক বিন্দু কি আবার আগের অবস্থানে ফিরে গেল?

তাহলে কি ওই কাচের ব্লক বা পেপারওয়েটটাই এজন্য দায়ী?

আলোকরশ্মি কোনো মাধ্যম দিয়ে যেতে যেতে যদি অন্য কোনো আলাদা মাধ্যমে প্রবেশ করে, তখন ওই মাধ্যম দুটির বিভেদতল থেকে আলোর গতিপথের পরিবর্তন ঘটে। এই ঘটনাকে আলোর প্রতিসরণ বলে।

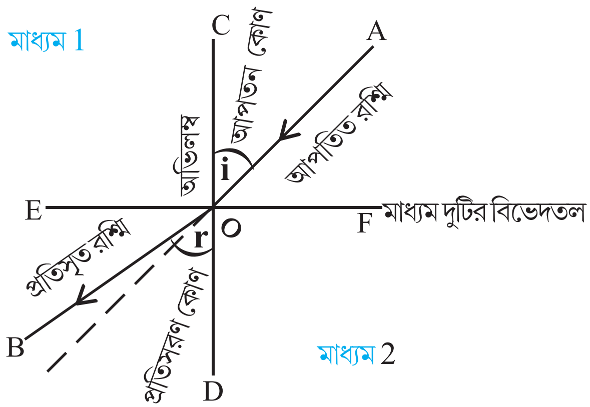

চিত্র - 1

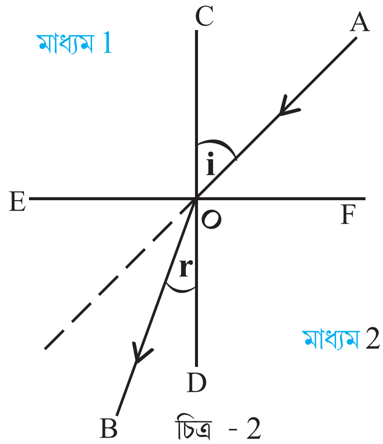

চিত্র - 2

আলোর প্রতিসরণ

OB - প্রতিসৃত রশ্মি, ∠AOC -আপতন কোণ (i), ∠DOB -প্রতিসরণ কোণ (r), EOF -মাধ্যমদ্বয়ের বিভেদতল, COD -অভিলম্ব।

চিত্র 1 -এ আলোকরশ্মি মাধ্যম 1 -থেকে মাধ্যম 2-তে প্রবেশ করেছে ও অভিলম্ব থেকে দূরে সরে গেছে। যে মাধ্যমে প্রবেশ করলে আলোকরশ্মি অভিলম্ব থেকে দূরে সরে যায় সেই মাধ্যমটিকে আলোর ক্ষেত্রে লঘুতর মাধ্যম বলা হয়। এখানে মাধ্যম 2, মাধ্যম 1-এর চেয়ে লঘুতর।

চিত্র 2-এ আলোকরশ্মি মাধ্যম 2-তে প্রবেশ করার পর অভিলম্বের দিকে সরে গেছে। যে মাধ্যমে প্রবেশ করলে আলোকরশ্মি অভিলম্বের দিকে সরে যায় সেই মাধ্যমকে আলোর ক্ষেত্রে ঘনতর মাধ্যম বলা হয়।

এক্ষেত্রে মাধ্যম 2, মাধ্যম 1-এর চেয়ে ঘনতর।

ধরা যাক, আলোক রশ্মিগুচ্ছ কোনো মাধ্যম দিয়ে চলতে চলতে দ্বিতীয় কোনো ভিন্ন ঘনত্বের মাধ্যমে যাত্রা করছে। দেখা যায় ওই আলোক রশ্মিগুচ্ছের কিছু অংশ মাধ্যমদ্বয়ের বিভেদতল থেকে পুনরায় প্রথম মাধ্যমে ফিরে আসে। এই ঘটনাটাই **আলোর প্রতিফলন**।

আলোক রশ্মিগুচ্ছের বাকি অংশ দ্বিতীয় মাধ্যমে প্রবেশের পর আগেকার যাত্রাপথ থেকে সরে যায় ও নতুন সরলরেখা বরাবর চলে। এই ঘটনাকে বলে **আলোর প্রতিসরণ**।

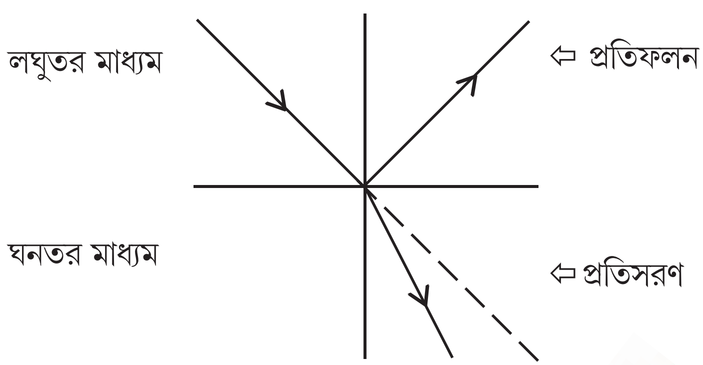

প্রতিবিম্ব

হাতেকলমে 6

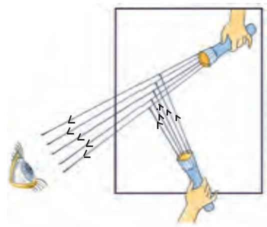

একটা আয়নার সামনে একটু কোণ করে (ছবির মতো) একটা টর্চ ধরো।

এবার টর্চটা জ্বালাও।

কী দেখলে?

আয়নায় টর্চের আলোর প্রতিফলন ঘটে আলো যে দিকে বেরিয়ে এল, তোমার চোখকে সেদিকে নিয়ে যাও। এবার ওই দিক থেকে আয়নার মধ্যে তাকাও। **কী দেখতে পাচ্ছ?**

তোমার কি মনে হচ্ছে আলোটা আয়নার ভিতরে থাকা একটা টর্চ থেকে আসছে?

সত্যিই কি আলো আয়নার ভিতরে থাকা টর্চ থেকে আসছে?

সত্যিই কি আয়নার ভিতরে কোনো টর্চ আছে?

আয়নার ভিতরে যে টর্চটা তুমি দেখেছ, সেটা আসলে তোমার হাতে থাকা (আয়নার বাইরে) টর্চটার প্রতিবিম্ব। এই ঘটনাটা ঘটেছে আলোর প্রতিফলন ধর্মের জন্য।

যে-কোনো চকচকে তলের উপর বস্তু থেকে আসা আলোকরশ্মির প্রতিফলনের ফলে এমনই প্রতিবিম্ব গঠিত হয়। বস্তুটি চকচকে তলটির যে দিকে থাকে, বস্তুর প্রতিবিম্ব ঠিক তার উলটোদিকে তৈরি হয়।

আলোকরশ্মির চিত্র এঁকে প্রতিবিম্ব তৈরি হওয়ার ঘটনাকে ব্যাখ্যা করা হয়। P - বস্তু, P/ -প্রতিবিম্ব, MM/- আয়না।

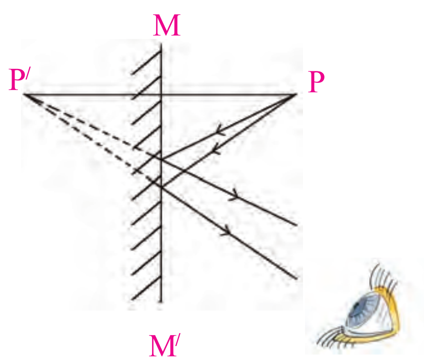

যে -কোনো চকচকে তল — সানগ্লাসের কাচ, চকচকে পালিশ করা টেবিল, পুকুরের জল, জানালার গাঢ় রঙের চকচকে কাচ ইত্যাদির মধ্যে এমন প্রতিবিম্ব গঠিত হওয়া সম্ভব।

হাতেকলমে 7

তুমি একটা বড়ো আয়নার সামনে দাঁড়াও। আয়নায় গঠিত হওয়া তোমার প্রতিবিম্বের দিকে লক্ষ করো।

তোমার আর তোমার প্রতিবিম্বের উচ্চতা কি এক?

এবার একটা পেন হাতে নিয়ে আয়নাটার উপর শুইয়ে দিয়ে, আঙুল দিয়ে চেপে ধরো।

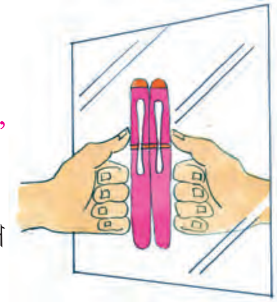

এবার দেখত তোমার আঙুলে চাপা পেন (আয়নার বাইরে) আর আয়নার ভিতরকার পেনের প্রতিবিম্ব একেবারে সমান মাপের কিনা?

আয়নায় গঠিত **'প্রতিবিম্ব'**ও **'বস্তুর মাপ'** (Size) সমান।

এবার একটি আয়না থেকে তুমি ঠিক মেপে মেপে 'চার পা' পিছিয়ে এসে দাঁড়াও।

এবার এক পা এক পা করে আয়নার দিকে এগোতে থাকো, আর তোমার প্রতিবিম্বের দিকে লক্ষ রাখো।

প্রতিবিম্বও কি তোমার সঙ্গে সঙ্গে এক পা এক পা করেই তোমার দিকে এগোচ্ছে?

তুমি আয়না পর্যন্ত পৌঁছোতে যত দূরত্ব অতিক্রম করলে তোমার প্রতিবিম্বও কী আয়না পর্যন্ত পৌঁছোতে তত দূরত্বই অতিক্রম করল ?

তাহলে বলা যায়, **'বস্তু থেকে আয়না ও আয়না থেকে প্রতিবিম্বের দূরত্ব সমান'**।

তোমার ডান হাতটা দিয়ে আয়নাটাকে স্পর্শ করো।

—প্রতিবিম্ব কোন হাত দিয়ে আয়নাটাকে স্পর্শ করল?

তোমার বাঁ পা-টা একটু ওঠাও।

তোমার প্রতিবিম্বের কোন পা উঠল?

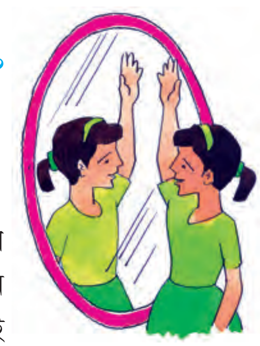

তবে বলা যায় **আয়নায় বস্তুর প্রতিবিম্বের পার্শ্ব পরিবর্তন হয়**। অর্থাৎ ডান দিকটা বাঁ দিক ও বাঁ দিকটা ডান দিক মনে হয়। কিন্তু উপরটা উপর দিকে এবং নীচেরটা নীচের দিকেই থাকে। অর্থাৎ আয়নায় গঠিত **প্রতিবিম্ব সমশীর্ষ**।

আয়নায় প্রতিফলনের ফলে, A থেকে Z পর্যন্ত কোন কোন অক্ষরের প্রতিবিম্বের পার্শ্বপরিবর্তন হয় তা ভেবে লেখো।

AMBULANCE কথাটা অ্যাম্বুলেন্স গাড়িতে উলটে লেখা থাকে কেন? দলে আলোচনা করে উত্তর খাতায় লেখো।

হাতেকলমে 8

একটা কাচের গ্লাসের মধ্যে একটা পেন বা সোজা কাঠি রাখো।

এবার গ্লাসটাতে কিছুটা জল ঢালো। পেন বা কাঠিটার কোনো অংশে কি কিছু পরিবর্তন লক্ষ করছ?

পরিবর্তন হলে সেটা কোন অংশে?

পেন বা কাঠিটার নীচের অংশ যেখান থেকে জলের ভেতরে আছে সেখান থেকে পেন বা কাঠিটাকে বাঁকা লাগছে কেন?

পেন বা কাঠিটাকে জল থেকে তুলে দেখো তো পেন বা কাঠিটা সত্যিই বেঁকেছে কিনা?

আসলে গ্লাসে জল ভরার পরই যেহেতু ঘটনাটা ঘটেছে, আবার জল থেকে পেন বা কাঠি তুলে নিলে পেন বা কাঠিটা যেহেতু সোজাই থাকে, তাহলে বোঝা যাচ্ছে, গ্লাসে জল ঢালাই এর কারণ।

আসলে গ্লাসে জল ঢালার পর গ্লাসের ভিতরে দুটো মাধ্যম থাকে। **(1) জল (ঘনতর মাধ্যম) ও (2) বায়ু (লঘুতর মাধ্যম)।**

পেন বা কাঠির জলের তলার অংশ থেকে আলো যখন জল (ঘনতর মাধ্যম) পেরিয়ে বায়ুতে (লঘুতর মাধ্যম) পৌঁছোয় তখন মাধ্যম দুটির বিভেদতল থেকে আলো বেঁকে গিয়ে তোমার চোখে এসে পড়ে। তোমার চোখ তখন আসল পেন বা কাঠিটার নিমজ্জিত অংশ নয়, পেন বা কাঠির নিমজ্জিত অংশের প্রতিবিম্বটি দেখো। প্রতিসরণের জন্যও প্রতিবিম্ব তৈরি হয়।

হাতেকলমে 9

একটা খালি বালতি নাও। একটা পেনসিল দিয়ে বালতির ভিতরের দেয়ালে উপরের দিকে একটা দাগ দাও (ছবি দেখো)। এবার একটা সোজা লাঠি দিয়ে বালতির তলা থেকে ওই পেনসিলের দাগ অবধি মেপে লাঠির গায়েও একই উচ্চতায় পেনসিলের দাগ দাও। এরপর লাঠিটা তুলে নাও।

এবার বালতিতে ওই দাগ অবধি জল ঢালো। বালতির উপর থেকে তাকাও।

কী দেখছ? বালতিটার তল কিছুটা উপরে উঠে এসেছে বলে মনে হচ্ছে কি? বালতিটা কম গভীর লাগছে?

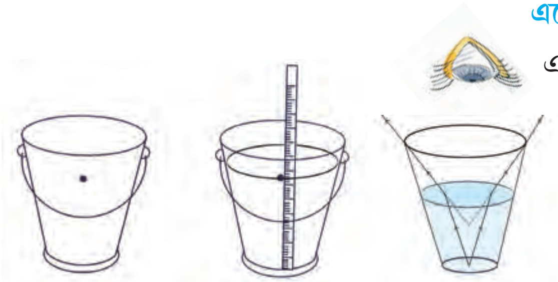

এবার জল থাকা অবস্থায় লাঠিটা দিয়ে বালতির দাগ অংশের উচ্চতা আবার মাপো।

কী দেখলে? কাঠির দাগের সঙ্গে বালতির দাগ মিলে যাচ্ছে। তবে বালতির তল কি সত্যি সত্যি উপরে উঠে আসেনি?

আসলে প্রতিসরণের জন্য এই ঘটনাটা ঘটেছে। বালতির তলদেশ থেকে আসা আলোক রশ্মিগুচ্ছ যখনই জল (ঘনতর মাধ্যম), পেরিয়ে বায়ুতে (লঘুতর মাধ্যম) প্রবেশ করে, সেইসময় মাধ্যমদ্বয়ের বিভেদতল থেকে আলোক রশ্মিগুচ্ছ অভিলম্ব থেকে দূরে সরে যায়। ফলে বেঁকে যাওয়া প্রতিসৃত রশ্মিগুচ্ছ যখন তোমার চোখে এসে পড়ে তখন তুমি ওই তলের প্রতিবিম্বকে দেখো, যা প্রকৃত তলদেশের কিছুটা উপরে অবস্থান করছে বলে মনে হয়। তাই তোমার মনে হয়েছে তলটা উপরে উঠে এসেছে।

বর্ণালি

হাতেকলমে 10

জানালার ফাঁক দিয়ে তোমার ক্লাসরুমের মেঝেতে, যেখানে কড়া রোদ এসে পড়েছে, সেখানে একটা সাদা কাগজ বিছিয়ে দাও। এবার একটা প্রিজম নিয়ে ওই আলোর পথে সাদা কাগজটার কাছাকাছি ধরো।

কী দেখতে পাচ্ছ?

এত রং কোথা থেকে এল? ভালো করে দেখো কি কি রং তুমি ওই রঙিন আলোর মধ্যে দেখতে পাচ্ছ।

সূর্যের আলো আসলে অনেক আলাদা রং-এর আলোর সমষ্টি। এধরনের আলোকে যৌগিক আলো বলে।

সূর্যের আলো কাচের প্রিজমের মধ্যে দিয়ে যাওয়ার সময় ওই বিভিন্ন রং-এর আলো আলাদা হয়ে যায়। আমরা ওই রংগুলোর মধ্যে চোখে দেখে মোটামুটিভাবে সাতটা রং-এর আলো আলাদা করতে পারি। এই সাতটা আলাদা হওয়া আলোর পটিকে একসঙ্গে বলে **'বর্ণালি'**। আর যৌগিক আলো থেকে এইভাবে বিভিন্ন রং-এর আলোগুলোর আলাদা হয়ে যাওয়ার ঘটনাকে **বিচ্ছুরণ বলে**। 1666 খ্রিস্টাব্দে বিজ্ঞানী আইজ্যাক নিউটন বিচ্ছুরণ আবিষ্কার করেন। সূর্যের আলোর মধ্যে থাকা এই সাতটা রং-এর আলোগুলো হলো—

1) বেগুনি (Violet)
2) নীল (Indigo)
3) আসমানি (Blue)
4) সবুজ (Green)
5) হলুদ (Yellow)
6) কমলা (Orange)
7) লাল (Red)

কিন্তু এই বিচ্ছুরণ পদ্ধতিতে বর্ণালির সাতটা রং-এর আলোর পটিকে পরিষ্কারভাবে দেখতে পাবে না। তার কারণ হলো আলোর পটিগুলো একটার উপর আর একটা এসে পড়তে পারে। ফলে মাঝের বর্ণগুলো ভালোভাবে দেখা যায় না।

তুমি আকাশে কখনও রংধনু দেখেছ?

আকাশের **রংধনু** আসলে সূর্যের সাদা আলোর **বিচ্ছুরণের** প্রাকৃতিক ঘটনা মাত্র।

রংধনু সাধারণত বৃষ্টির পর বিকেলের আকাশে দেখতে পাওয়া যায়। আকাশে ভাসমান জলকণা থাকে। ওই জলকণার মধ্যে দিয়ে সূর্যের আলো যাওয়ার সময় বিচ্ছুরণের ফলে আকাশে যে সাতটা আলোর পটি গঠিত হয় সেটাই রংধনু।

অদৃশ্য আলোর ক্ষতিকারক প্রভাব

অতিবেগুনি রশ্মি : সূর্য থেকে যে আলো এসে পৃথিবীতে পড়ে তার সবটুকু আমরা চোখে দেখতে পাই না, অদৃশ্য আলোও কিছু আছে। চোখে দেখতে না পেলেও অদৃশ্য আলো যে আছেই বিজ্ঞানীদের কাছে তার অনেক প্রমাণ আছে। অদৃশ্য আলোর একটা অংশ হলো অতিবেগুনি আলো, ইংরেজিতে আল্ট্রাভায়োলেটলাইট (ultraviolet light)। এর শক্তি দৃশ্যমান আলোর চেয়ে অনেক বেশি, তাই জীবন্ত কোশের পক্ষে অতিবেগুনি আলো অত্যন্ত ক্ষতিকারক। সরাসরি চোখে পড়লে চোখের লেন্সের ক্ষতি হয়, চোখের মধ্যের যে আলোক সংবেদী স্তর (বা রেটিনা) আছে তারও ক্ষতি করে। এছাড়াও চামড়ায় সূর্যালোকের অতিবেগুনি রশ্মি পড়লে চামড়ার ক্যানসারও হতে পারে। তাহলে জীবজগৎ সূর্যালোকের অতিবেগুনি রশ্মির হাত থেকে বাঁচবে কী করে? পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের উপরদিকে ওজোন গ্যাসের স্তর আছে। এই ওজোন স্তর সূর্যরশ্মির অতিবেগুনি রশ্মিকে আসতে বাধা দেয়। তা না হলে আমাদের খুবই বিপদ হতো।

ওজোন স্তর আছে বলে নিশ্চিন্ত হবার দিন আর নেই। মানুষের কর্মকাণ্ডে এমন সব গ্যাসীয় পদার্থ ওজোন স্তরে পৌঁছোচ্ছে যারা ওজোন অণুকে ভেঙে দেয়, বা তৈরি হতেও বাধা দেয়। এর ফলে ধীরে ধীরে ওজোন স্তর নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। আমাদের চামড়ার মেলানিন বলে একরকমের রঞ্জক পদার্থ তৈরি হয়। চামড়ায় অতিবেগুনি রশ্মি এসে পড়লে তাকে শুষে নিয়ে মেলানিন আমাদের চামড়ার নীচের কোশগুলোকে বাঁচিয়ে দেয়। মেলানিন বেশি থাকলে চামড়া বাদামি বা কালো হয়ে যায়। লক্ষ করে দেখো, আফ্রিকা পৃথিবীর নিরক্ষীয় অঞ্চলে, তাই সেখানে সূর্য রশ্মি খুব প্রখর। সেখানকার কালো মানুষদের চামড়ার মেলানিনের পরিমাণও তাই অনেক বেশি। বিভিন্ন ইউরোপীয় দেশের সাদা চামড়ার মানুষদের চামড়ায় কিন্তু মেলানিনের পরিমাণ অনেক কম। তাই সাদা চামড়ার মানুষদের অতিবেগুনি রশ্মির প্রভাবে ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনাও বেশি। অতিবেগুনি রশ্মির প্রভাবে কোশের খুব দরকারি ডি.এন.এ অণুর (DNA) ক্ষতি হয়। ওজোন স্তর ক্রমশ ক্ষয় হয়ে যাওয়ার ফলে পৃথিবীতে চামড়ার ক্যানসারে আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা ধীরে ধীরে বাড়ছে।

এক্স রশ্মি : তোমরা নিশ্চয়ই জানো যে হাত ভাঙলে, বা পড়ে গিয়ে কোমরে চোট পেলে ডাক্তারবাবু ‘এক্স-রে’ করিয়ে আসতে বলেন। এক্স-রশ্মি (X-Ray) কী? ‘রে’ মানে রশ্মি বা আলো। এক্স রেও একরকমের অদৃশ্য আলো। এক্স-রশ্মি চামড়া আর মাংস ভেদ করে যেতে পারে। এক্স রশ্মি হাড়ের মধ্যে দিয়ে চলে যেতে পারে না তাই হাড়ের কোনখানটা ভেঙেছে বা ক্ষয়ে গেছে তা ছবি তুলে বোঝা যায়। এক্স-রশ্মিও কিন্তু দীর্ঘ ব্যবহারে ক্যানসার সৃষ্টি করে। এই কারণেই গর্ভস্থ শিশুর এক্স-রে করা উচিত নয়। যেসব কর্মী এক্স-রশ্মি মেশিন চালনা করেন উপযুক্ত সাবধানতা না নিলে তাঁদের ক্যানসার হতে দেখা যায়।

জীবের শারীরবৃত্তীয় ক্রিয়ায় আলোর ভূমিকা

টুকুন উঠোনের পাশে টবের মাটিতে কয়েকটা বীজ ফেলেছিল। দিন কয়েক পর লক্ষ করল বীজ থেকে একটা ছোটো চারা বেরিয়েছে। আর ক্রমশ ওই চারার ডগার দিকটা অন্ধকার স্যাঁতসেঁতে জায়গা থেকে আলোর দিকে এগিয়ে যাচ্ছে (ছবিতে লক্ষ করো আলো বামদিক থেকে আসছে আর গাছ সেদিকে বেঁকে যাচ্ছে)।

আলো ছাড়া গাছের খাদ্য তৈরি করা সম্ভব নয়। অন্ধকারে উদ্ভিদ বেঁচে থাকতে পারে না। ইটের নীচে বেশ কয়েকদিন চাপা পড়লে ঘাসগুলোর রং পরিবর্তন হয়। বেশিদিন চাপা পড়ে থাকলে মরেও যায়। উদ্ভিদের সবুজ অঙ্গগুলো আলোকশক্তি শোষণ করে তাকে খাদ্যের শক্তি পরিণত করে। তারপর ওই খাদ্য ভেঙে পাওয়া শক্তিকে কাজে লাগিয়ে উদ্ভিদের নানা অঙ্গে সাড়া জাগে।

কেমন এই সাড়া এসো দেখা যাক।

বিভিন্ন দেশে শীত ও গরমকালে দিনের দৈর্ঘ্যের পার্থক্য ঘটে। এজন্য গরমকাল আর শীতকালে ভিন্ন ভিন্ন ফুল ফোটে।

গরমকালে ফোটে এমন কয়েকটি ফুলের নাম লেখো ।

শীতকালে ফোটে এমন কয়েকটি ফুলের নাম লেখো ।

টুকরো কথা

গম, ভুট্টা, পালং ও মুলোগাছে দিনের দৈর্ঘ্য 12 ঘন্টার বেশি হলে তবে ফুল ফোটে। আবার চন্দ্রমল্লিকা, ডালিয়া, আখ ও আলুগাছে দিনের দৈর্ঘ্য 12 ঘন্টার কম হলে তবে ফুল ফোটে। আর টম্যাটো, সূর্যমুখী গাছের ফুল ফোটা দিনের দৈর্ঘ্যের কমা-বাড়ার ওপর নির্ভরশীল ।

তোমার জানা দুটি করে গাছের নাম লেখো যাদের ফুল ফোটার জন্য —

12 ঘন্টার বেশি আলোর প্রয়োজন হয়।

12 ঘন্টার কম আলোর প্রয়োজন হয়।

প্রাণীজগতেও আলোর নানা প্রভাব দেখা যায়। আলো কম পেলে স্যামন মাছের বাচ্চারা মরে যায়। সূর্যের আলো কম পেলে গিরগিটি, সাপ ও আরো কত প্রাণী (ছুঁচো, ভালুক, ব্যাং) শীতঘুমে চলে যায়। ডানদিকের নীচের ছবিতে এক ধরনের ব্যাং কীভাবে নিজের পুরো দেহকে লুকিয়ে ফেলেছে দেখো। গুহাবাসী অনেক প্রাণীকে আলোতে আনলে তাদের চামড়ায় রঙিন পদার্থ তৈরি হতে শুরু হয়। সূর্য যখন মেঘের আড়ালে ঢাকা পড়ে তখন পঙ্গপালের চলাফেরা বন্ধ হয়ে যায়। কোনো কোনো প্রাণী খোলস ছাড়া বা চামড়ার নীচে ফ্যাট জমা হওয়ার প্রক্রিয়াও আলোর প্রভাবে ঘটে। পরিযায়ী পাখিদের খুব শীতের জায়গা থেকে অপেক্ষাকৃত গরম জায়গায় উড়ে যাওয়া সূর্যের আলোর তীব্রতার উপর নির্ভর করে। জোনাকির মতো অনেক প্রাণী আবার আলো তৈরি করে নিজেদের মধ্যে যোগাযোগ রক্ষা করে।

এবার শিক্ষক/শিক্ষিকার সঙ্গে বা বন্ধুদের সঙ্গে আলোচনা করে নীচের প্রভাবগুলির উদাহরণ তোমার চারপাশের পরিবেশের বিভিন্ন জীব থেকে খুঁজে বার করার চেষ্টা করো। (মাছ, পিঁপড়ে, পাখি, আরশোলা, ব্যাং, কেঁচো বা তোমার পরিচিত প্রাণী।)

আলোর প্রভাবে জীবের চলাফেরা।

আলোর প্রভাবে জীবের ডিম পাড়া।

আলোর প্রভাবে জীবের চোখের রং পরিবর্তিত হওয়া।

আলোর প্রভাবে জীবের চামড়ার রং বদলে যাওয়া।

চুম্বক

চুম্বকের বিভিন্ন ধর্ম

হাতেকলমে-1

উপকরণঃ একটা ইরেজার, একটা লোহার পেরেক, একটা প্লাস্টিকের স্কেল, একটা কাঠ পেনসিল, একটা পেনসিল কম্পাস, একটা এক টাকার কয়েন, একটা গাছের পাতা, একটা স্টেইনলেস স্টিলের চামচ, একটা ব্লেড, একটা কাচের গ্লাস ও একটা চুম্বক।

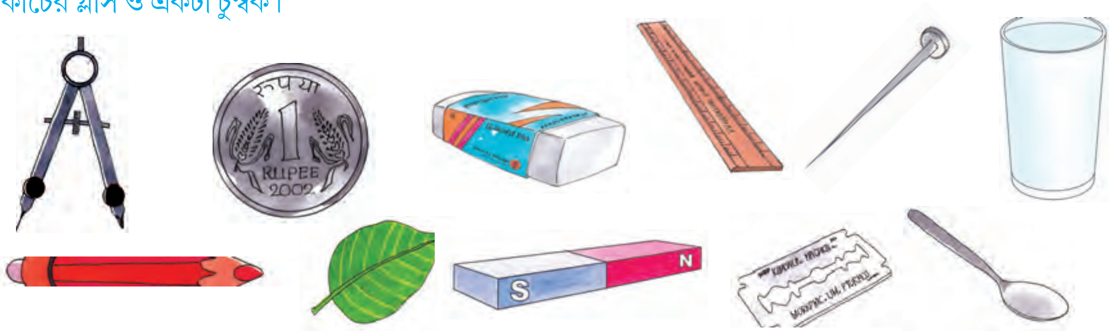

একটা কাঠের টেবিলের উপরে সবকটা উপকরণ রাখো। শুধু দণ্ড চুম্বকটা তোমার হাতে নাও। এবার দণ্ড চুম্বকটাকে টেবিলের উপর রাখা প্রতিটি জিনিসের কাছে নিয়ে যাও।

দণ্ড চুম্বক ঃ দণ্ড চুম্বক হলো একটা আয়তঘনাকার চুম্বকিত ইস্পাতের দন্ড। এই চুম্বক এক প্রকার কৃত্রিম চুম্বক।

খেয়াল করো, চুম্বকটা কোন কোন জিনিসকে আকর্ষণ করছে, আর কোন কোন জিনিসকে আকর্ষণ করছে না। এরপর নীচের সারণিটাকে পূরণ করো।

নাম	উপযুক্ত স্থানে '✓' চিহ্ন দাও		জিনিসগুলো যে উপাদানে তৈরি সেই উপাদানের নাম
	চুম্বক আকর্ষণ করছে	চুম্বক আকর্ষণ করছে না	
ইরেজার			
লোহার পেরেক			
প্লাস্টিক স্কেল			
কাঠ পেনসিল			
পেনসিল কম্পাস			
টাকার কয়েন			
গাছের পাতা			
স্টিলের চামচ			
ব্লেড			
কাচের গ্লাস			

চুম্বক যে যে পদার্থকে আকর্ষণ করে তাদের ‘চৌম্বক পদার্থ’ বলে। এদের বিশেষ উপায়ে চুম্বকে পরিণত করা যায়।

যেমন ঃ লোহা, নিকেল, কোবাল্ট, কোনো কোনো ধরনের ইস্পাত ইত্যাদি।

যে যে পদার্থকে চুম্বক আকর্ষণ করতে পারে না তাদের ‘অচৌম্বক পদার্থ’ বলে।

যেমন ঃ প্লাস্টিক , রবার, কাঠ, কাগজ ইত্যাদি।

একটা গল্প আছে। প্রায় 2500 বছর আগে ম্যাগনেস (Magnes) নামে এক মেষপালক পাহাড়ের কোলে এক তৃণভূমিতে মেষ পালন করছিল। হঠাৎ তার পায়ের জুতোয় একটা টান অনুভব করল। আসলে জুতোয় ছিল লোহার পেরেক। পেরেকটাকে একটা পাথর আকর্ষণ করার ফলেই ঘটনাটা ঘটেছিল। পরে জানা গেল, পাথরটা সব লোহাকেই আকর্ষণ করার ক্ষমতা রাখে।

ম্যাগনেসিয়া নামক অঞ্চলে এরকম প্রচুর পাথরের সন্ধান পাওয়া যায়। চুম্বকের ইংরাজি নাম ম্যাগনেট (Magnet) হওয়ার এটাই কারণ। এই পাথরের নাম হলো ‘ম্যাগনেটাইট’। একে ‘প্রাকৃতিক চুম্বক’ বলে।

তাহলে জানা গেল, চুম্বক দুরকমের।

চুম্বক

প্রাকৃতিক চুম্বক বা ম্যাগনেটাইট	কৃত্রিম চুম্বক
এই চুম্বক প্রকৃতিতে পাওয়া যায় বলে একে প্রাকৃতিক চুম্বক বলে। এই চুম্বক সহজে বাজারে কিনতে পাবে না। যেসব জায়গায় এই খনিজ দ্রব্যের খনি আছে সেখানেই শুধু এই পাথর পাওয়া সম্ভব।	চৌম্বক পদার্থকে বিশেষ উপায়ে চুম্বকে পরিণত করে এই চুম্বক তৈরি করা হয়।

হাতেকলমে 2

একটা দণ্ড চুম্বক নাও। মেঝের উপর চক দিয়ে উত্তর-দক্ষিণ বরাবর একটা সরলরেখাংশ আঁকো। এবার ওই রেখাংশের উত্তর প্রান্তে N ও দক্ষিণ প্রান্তে S লেখো।

এবার ছবির মতো করে SN রেখা বরাবর দণ্ড চুম্বকটাকে সুতো দিয়ে ঝুলিয়ে দাও। কাছাকাছি অন্য কোনো চুম্বক বা তড়িৎ প্রবাহিত হচ্ছে এমন বস্তু যেন না থাকে।

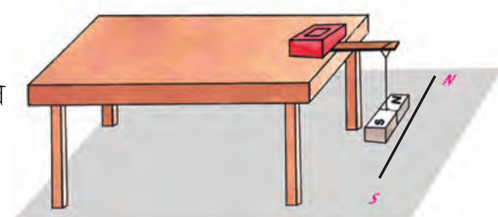

এবার চুম্বকটাকে একটু নাড়িয়ে ছেড়ে দাও। অবশেষে চুম্বক যখন সাম্যাবস্থায় এল-

তুমি কী দেখতে পেলে ?

চুম্বকটা কি উত্তর-দক্ষিণ মুখ করে রয়েছে ?

চুম্বকটাকে আবার একটু নাড়িয়ে সাম্য অবস্থায় আসতে দাও।

এবার কী দেখতে পাচ্ছ ?

প্রতিবারই কি চুম্বকটা উত্তর-দক্ষিণ মুখ করে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকছে ?

তাহলে জানা গেল, চুম্বককে স্বাধীনভাবে ঘুরতে পারবে এমনভাবে ঝুলিয়ে দিলে তা সর্বদা 'উত্তর-দক্ষিণ' মুখ করে থাকে।

এবার ওই চুম্বকটাকে একটা থার্মোকলের টুকরোর উপর বসাও এবং থার্মোকলের টুকরোটা একটা প্লাস্টিকের জলভরা পাত্রে ভাসিয়ে দাও। জল স্থির হলে এবং চুম্বকসহ থার্মোকল সাম্য অবস্থায় এলে, চুম্বক কোন দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে রয়েছে লক্ষ করো।

এবার চুম্বকসহ থার্মোকলকে আস্তে করে ঘুরিয়ে দিয়ে ছেড়ে দাও। সাম্য অবস্থায় এলে লক্ষ করো চুম্বকটা কোন দিকে মুখ করে আছে।

স্বাধীনভাবে ভাসমান বা ঝুলন্ত চুম্বকের এই উত্তর-দক্ষিণ মুখ করে থাকার ধর্মকে চুম্বকের **দিক-নির্দেশক ধর্ম** বলে।

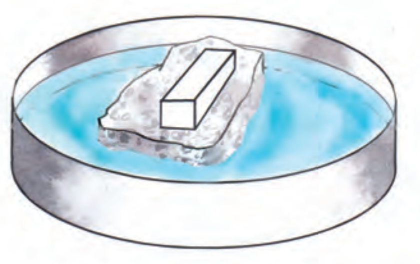

চুম্বক সংক্রান্ত নানা পরীক্ষানিরীক্ষা করার জন্য এক ধরনের খুব দরকারি চুম্বক পাওয়া যায়। এধরনের চুম্বককে 'চুম্বক শলাকা' বলে। চুম্বক শলাকা হলো আসলে একটা ছোট্ট হালকা চুম্বকিত ইস্পাতের পাত। দু-প্রান্ত সুচোলো এই চুম্বক একটা খাড়া দণ্ডের ওপর মুক্ত অবস্থায় রাখা হয়। কোন কোন ক্ষেত্রে তা ছোট্ট কাচের বাক্সের মধ্যে রাখা থাকে। এই চুম্বক নানা মাপেও পাওয়া যায়।

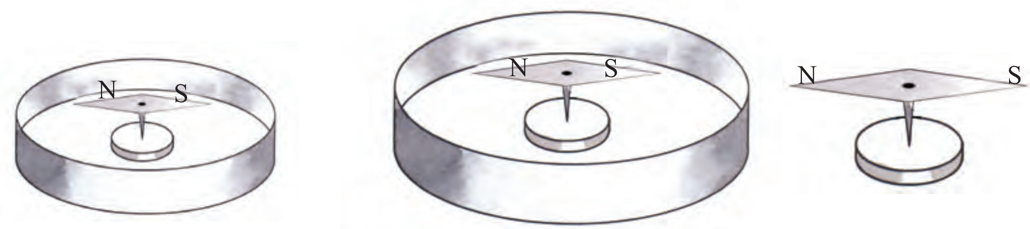

হাতেকলমে 3

একটা লম্বা দণ্ড চুম্বক, কিছুটা লোহাচুর, একটা সাদা কাগজ নাও।

কাঠের টেবিলের উপর সাদা কাগজটা পাতো। এবার লোহাচুরগুলো সাদা কাগজের ওপর রাখো।

এখন চুম্বকটার সারা গায়ে লোহাচুরগুলো মাখাতে চেষ্টা করো।

এবার নীচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।

লোহাচুরগুলো কী চুম্বকের সব জায়গায় সমানভাবে আটকাচ্ছে?

চুম্বকের কোন জায়গায় লোহাচুর সবচেয়ে বেশি আটকেছে?

চুম্বকের কোন জায়গায় লোহাচুর সবচাইতে কম আটকেছে?

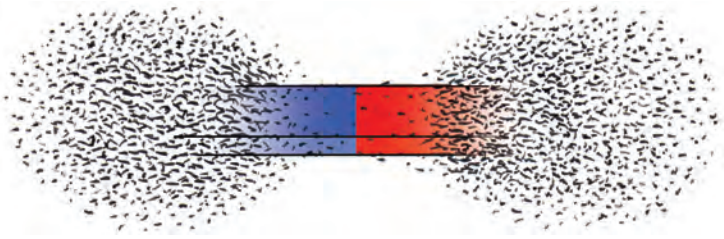

উপরের পর্যবেক্ষণ থেকে চুম্বকের আকর্ষণ ক্ষমতা কোথায় সবচেয়ে বেশি বলে তোমার মনে হয়? চুম্বকের কোন জায়গায় আকর্ষণ ক্ষমতা সবচেয়ে কম বলে তোমার মনে হয়?

জেনে রাখা দরকার

চুম্বকের দুই প্রান্তে যে দুই অঞ্চলে চুম্বকের আকর্ষণ ক্ষমতা সবচেয়ে বেশি, সেই দুই অঞ্চলকে চুম্বকের 'মেরু' বলে। এই মেরু দুটিকে দুটি বিন্দু হিসেবে ভাবা যেতে পারে।

চুম্বকের ঠিক মাঝখানে চুম্বকের আকর্ষণ ক্ষমতা প্রায় নেই বললেই চলে। ওই অঞ্চলকে চুম্বকের উদাসীন অঞ্চল বলে।

হাতেকলমে 4

একটা দণ্ড চুম্বক, দুটো চুম্বক শলাকা, একটা পেনসিল ও একটা সাদা কাগজ নাও। সাদা কাগজটা একটা টেবিলের উপর আটকে দাও। এবার দণ্ড চুম্বকটা কাগজের উপর রাখো। এরপর দণ্ড চুম্বকের N-মেরুর দুই কোণ বরাবর ছবির মতো করে চুম্বক শলাকা দুটি রাখো।

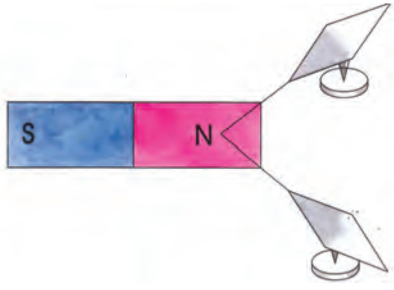

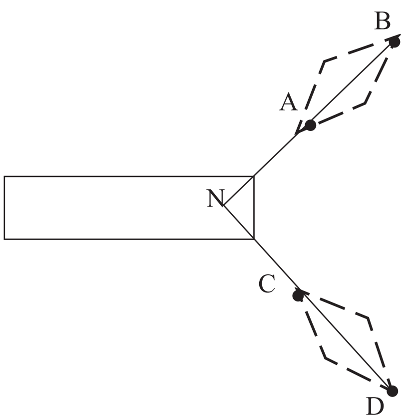

এখন পেনসিল দিয়ে দণ্ড চুম্বকটির ধার ঘেঁষে দাগ কাটো। তারপর চুম্বক শলাকাদুটোর দুই প্রান্তবিন্দুর অবস্থান পেনসিল দিয়ে সাদা কাগজটায় বিন্দু এঁকে চিহ্নিত করো। বিন্দুগুলিকে A,B ও C,D নাম দাও।

এবার BA ও DC যুক্ত করে বাড়িয়ে দাও। ওই সরল রেখাংশ দুটো যে বিন্দুতে (N) ছেদ করল, সেই বিন্দুটাই জ্যামিতিক ভাবে দণ্ড চুম্বকের উত্তর মেরুর অবস্থান।

এরকম করে তুমি চুম্বকটার দক্ষিণ মেরুর অবস্থান নির্ণয় করো। চুম্বকের মেরুবিন্দু দুটি আসলে চুম্বকের দুই প্রান্তদেশের কাছাকাছি চুম্বকের ভেতরে অবস্থান করে।

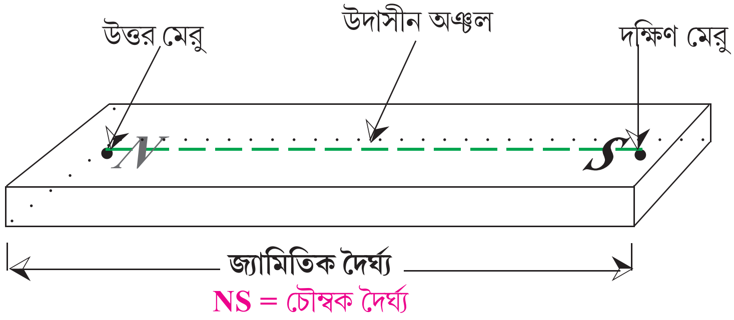

চুম্বকের এই দুই মেরুর মধ্যবর্তী দূরত্বকে **চৌম্বক দূরত্ব** বলে। এই দৈর্ঘ্য চুম্বকের **জ্যামিতিক দৈর্ঘ্যের 0.86 গুণ**।

অর্থাৎ **চৌম্বক দৈর্ঘ্য = চুম্বকটির জ্যামিতিক দৈর্ঘ্য × 0.86।**

অবাধে ঝুলন্ত বা ভাসমান অবস্থায় চুম্বকের যে মেরু মোটামুটি উত্তর দিকে মুখ করে থাকে তাকে **উত্তর সন্ধানী মেরু বা উত্তর মেরু** (N) বলে। আর যে মেরু মোটামুটি দক্ষিণ দিকে মুখ করে থাকে তাকে **দক্ষিণ সন্ধানী মেরু বা দক্ষিণ মেরু** (S) বলে।

চুম্বকের উত্তর ও দক্ষিণ মেরু যোগ করলে যে সরলরেখাংশ (NS) পাওয়া যায় তাকে **চৌম্বক অক্ষ** বলে।

একটা চুম্বকের চারধারে যে স্থান জুড়ে ওই চুম্বকের আকর্ষণ বা বিকর্ষণ ধর্ম কাজ করে তাকে ওই চুম্বকের **চৌম্বক ক্ষেত্র** বলে।

হাতেকলমে 5

ছবির মতো করে বা অন্য কোনোভাবে সুতো দিয়ে একটা দণ্ড চুম্বককে ঝুলিয়ে দাও। খেয়াল রাখো যেন আশেপাশে কোনো চৌম্বক পদার্থ বা চুম্বক না থাকে।

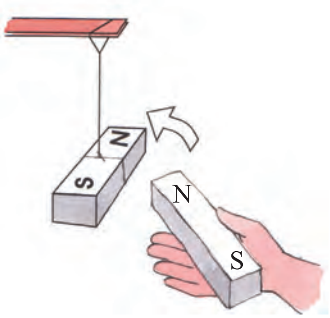

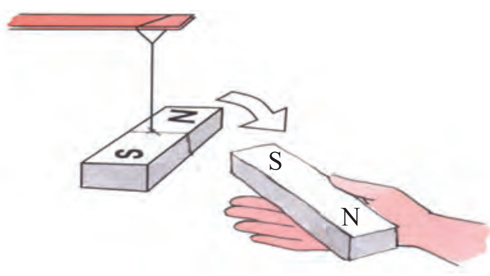

চুম্বকটাকে সাম্য অবস্থায় আসতে দাও। এবার অন্য একটা দণ্ড চুম্বকের উত্তর মেরু (N) ঝুলন্ত চুম্বকের উত্তর মেরুর (N)- এর কাছে নিয়ে যাও।

কী দেখতে পেলে?

ঝুলন্ত চুম্বকের উত্তর মেরু সরে গেল কেন?

তাহলে কী ঝুলন্ত চুম্বকের উত্তর মেরুর উপর কেউ 'বল' প্রয়োগ করেছে?

এই বল কোথা থেকে প্রযুক্ত হলো?

কাছাকাছি দ্বিতীয় চুম্বকের উত্তর মেরু ছাড়া আর তো কিছু ছিল না। তবে কি দ্বিতীয় চুম্বকের উত্তর মেরুই এই বল প্রয়োগ করেছে?

তাহলে বোঝা গেল, একটা চুম্বকের উত্তর মেরু অপর চুম্বকের উত্তর মেরুকে বিকর্ষণ করে।

এবার সাম্য অবস্থায় চুম্বকের দক্ষিণ মেরুর (S) কাছে হাতের চুম্বকের দক্ষিণ (S) মেরুটাকে ধরো।

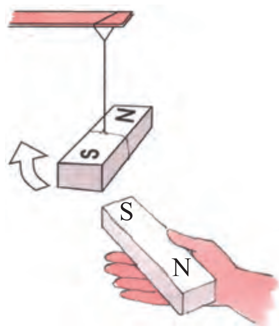

এক্ষেত্রে কী দেখতে পেলে? এ থেকে তুমি কী সিদ্ধান্তে আসতে পারো?

অতএব বোঝা গেল চুম্বকের সমমেরু পরস্পরকে বিকর্ষণ করে। অর্থাৎ S-মেরু, S-মেরুকে এবং N-মেরু, N মেরুকে বিকর্ষণ করে।

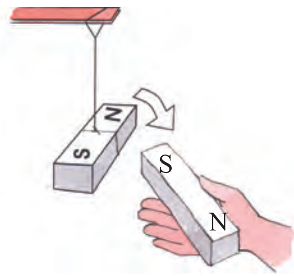

এবার ঝুলন্ত চুম্বকের N মেরুর কাছে, দ্বিতীয় **চুম্বকের** S-মেরু নিয়ে যাও।

কী দেখতে পাচ্ছ?

ঝুলন্ত চুম্বকের S মেরু তোমার হাতের চুম্বকের N মেরুর কাছে সরে এল কেন?

এই দুই বিপরীত মেরুর (N ও S) মধ্যে কোনো ধরনের বল কাজ করছে কি? (আকর্ষণ বল না বিকর্ষণ বল?)

এবার হাতের দণ্ড চুম্বকের N মেরু সাম্য অবস্থায় ঝুলন্ত দণ্ড চুম্বকের S মেরুর কাছে ধরো।

এখন কী দেখতে পেলে?

এবারেও কি পরস্পর দুই বিপরীত মেরু (N ও S) পরস্পরকে আকর্ষণ করল?

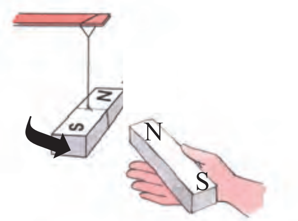

অতএব জানা গেল চুম্বকের বিপরীত মেরু (N ও S) পরস্পর পরস্পরকে আকর্ষণ করে।

ঝুলন্ত চুম্বকটির কাছে অন্য চুম্বকের বিপরীত মেরু নিয়ে আসায় আকর্ষণ হলো। যদি কোনো একটি লোহার দণ্ড বা স্টিলের দণ্ড আনা হতো তাহলেও তো আকর্ষণই হতো। তাহলে আকর্ষণ হচ্ছে দেখে কি জোর দিয়ে বলা যাবে যে দ্বিতীয় বস্তুটিও চুম্বক?

এবার ভেবে দেখো যদি বিকর্ষণ হতো তাহলে দ্বিতীয় বস্তুটির বিষয়ে তুমি কী বলতে? চুম্বক, না লোহা বা স্টিলের দণ্ড?

কোনো বস্তু চুম্বক কিনা তা জানতে আকর্ষণ, না বিকর্ষণ কোনটি বেশি নির্ভরযোগ্য বলে তোমার মনে হয়?

হাতেকলমে 6

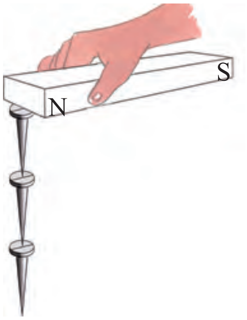

একটা শক্তিশালী দণ্ড চুম্বক, একটা লোহার দণ্ড, কয়েকটা ছোটো লোহার পেরেক আর একটা চুম্বক শলাকা নাও।

একটা লোহার পেরেক আর একটা পেরেকের সঙ্গে স্পর্শ করো।

কী দেখতে পেলে?

ওই পেরেক কি অন্য পেরেককে আকর্ষণ করল?

এবার ছবির মতো করে দণ্ড চুম্বকটাকে ধরো। এবার যে-কোনো মেরু, ধরা যাক 'N' মেরুর নীচে একটা লোহার পেরেক স্পর্শ করে ছেড়ে দাও। পেরেকটা দণ্ড চুম্বকের সঙ্গে আটকে যাবে।

এখন আর একটা পেরেক প্রথম পেরেকটার তলায় স্পর্শ করে ছেড়ে দাও।

এবার কী দেখতে পাচ্ছ?

দ্বিতীয় পেরেকটা প্রথম পেরেকটার তলায় স্পর্শ করে ঝুলছে কেন? কেন পড়ে যাচ্ছে না?

তবে কী প্রথম পেরেকটা দ্বিতীয় পেরেকটাকে আকর্ষণ করছে? কেন?

এভাবে আর কয়েকটা পেরেক নিয়ে দেখো তো একটা পেরেকের চেন তৈরি করতে পারো কিনা।

এবার খুব সাবধানে অন্য হাত দিয়ে প্রথম পেরেকটাকে ধরো (সাবধানে, যাতে নাড়াচাড়ায় পেরেকের চেন থেকে পেরেক খসে না পড়ে)। এখন আস্তে করে দণ্ড চুম্বকটাকে সরিয়ে নাও।

এখন কী দেখতে পাচ্ছ?

পেরেকগুলো সব খসে পড়ে গেল কেন?

তোমরা জানো, চুম্বক লোহাকে আকর্ষণ করে। লোহা লোহাকে আকর্ষণ করে না। তাই প্রথম ক্ষেত্রে, একটা লোহার পেরেক আর একটা লোহার পেরেককে আকর্ষণ করেনি।

দ্বিতীয় ক্ষেত্রে, প্রথম লোহার পেরেক দ্বিতীয়টাকে আকর্ষণ করে। কিন্তু সেক্ষেত্রে প্রথম পেরেকটাকে দণ্ড চুম্বক আকর্ষণ করে রেখেছিল। দণ্ড চুম্বক সরিয়ে নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রথম পেরেকটার আকর্ষণ ক্ষমতাও চলে যায়। তাহলে নিশ্চয়ই দণ্ড চুম্বকটার জন্যই প্রথম পেরেকটা দ্বিতীয় পেরেককে আকর্ষণ করার ক্ষমতা অর্জন করেছিল।

আসলে, দণ্ড চুম্বকের প্রভাবে প্রথম পেরেকটা সাময়িকভাবে চুম্বকে পরিণত হয়। এই ঘটনাকে '**চৌম্বক আবেশ**' বলে।

এভাবে 'আবেশের' ফলে চুম্বকে পরিণত হওয়া প্রথম পেরেকের প্রভাবে দ্বিতীয় পেরেকটিতে চুম্বকত্ব আবেশিত হয়, তার প্রভাবে তৃতীয় পেরেক চুম্বকে পরিণত হয়। এভাবেই পেরেকের চেনটা তৈরি হয়েছিল।

এই পরীক্ষা থেকে আমরা আরও জানতে পারলাম যে, **চুম্বক যখন কোনো চৌম্বক পদার্থকে আকর্ষণ করে, তার আগে ওই চৌম্বক পদার্থকে আবেশিত করে চুম্বকে পরিণত করে।** তাই বলা যায়, '**আকর্ষণের পূর্বে আবেশ হয়**'।

হাতেকলমে 7

একটা দণ্ড চুম্বক নাও। এর একপ্রান্তে উত্তর মেরু আর এক প্রান্তে দক্ষিণ মেরু।

এবার, চুম্বকটাকে মাঝখান থেকে দুই টুকরো করো।

দেখত চুম্বকটার উত্তর ও দক্ষিণ মেরুকে আলাদা করা গেল কিনা?

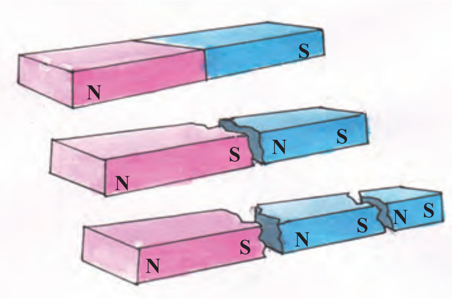

একটা চুম্বকশলাকা দিয়ে পরীক্ষা করে দেখো, টুকরোদুটোর প্রত্যেকটার দুই প্রান্তে বিপরীত মেরুর (N ও S) সৃষ্টি হয়েছে।

এবার ওই দুই টুকরোর প্রত্যেকটাকে দুই টুকরো করে দেখো, N ও S মেরুকে আলাদা করা যায় কিনা।

প্রতি টুকরো আলাদা করে চুম্বক শলাকা দিয়ে পরীক্ষা করে দেখো, আবার ওই টুকরোতে N ও S মেরু সৃষ্টি হয়ে গেছে।

তাহলে বোঝা গেল, আলাদাভাবে শুধু একটা চৌম্বক মেরুর অস্তিত্ব সম্ভব নয়।

এক নজরে চুম্বকের বিভিন্ন ধর্ম

চুম্বকের আকর্ষণ ধর্ম।

দিক নির্দেশক ধর্ম।

সমমেরু পরস্পরকে বিকর্ষণ ও বিপরীতমেরু পরস্পরকে আকর্ষণ করে।

আবেশী ধর্ম।

আগে আবেশ পরে আকর্ষণ হয়।

চুম্বকের সর্বদা দুটি বিপরীত মেরু থাকে।

একক মেরুর অস্তিত্ব নেই।

পৃথিবী নিজেই কি একটি চুম্বক ?

একটি ঝুলন্ত দণ্ড চুম্বক উত্তর-দক্ষিণ মুখ করে আছে। পকেটে অন্য একটি চুম্বক নিয়ে তোমার বন্ধু যদি ওই ঝুলন্ত চুম্বকটির সামনে গিয়ে দাঁড়ায় তাহলে কী হবে?

ঝুলন্ত চুম্বকটি কি উত্তর-দক্ষিণ মুখ করে থাকবে?

তাহলে ভেবে দেখত কিসের প্রভাবে একটি ঝুলন্ত চুম্বক তার ঝুলে থাকার দিক পরিবর্তন করে?

এবার ভাবো, যখন আশেপাশে কোনো চুম্বক নেই তখন ঝুলন্ত চুম্বক দণ্ড যেমন তেমনভাবে না থেকে শুধু উত্তর-দক্ষিণ মুখ করে থাকে কেন? তাহলে কি এমন অন্য কোনো চুম্বক আছে যা এইভাবে যে-কোনো ঝুলন্ত চুম্বক দণ্ডকে যেমন তেমনভাবে থাকতে দিচ্ছে না?— পৃথিবীই হলো সেই চুম্বক।

পৃথিবী যে নিজেই একটা চুম্বক তার সপক্ষে অনেক প্রমাণ আছে।

একটা লোহার দণ্ডকে বহুদিন ধরে পৃথিবীর উত্তর- দক্ষিণ দিক বরাবর রেখে দিলে দেখা যায় ওই দণ্ডের মধ্যে ক্ষীণ চুম্বকত্ব সৃষ্টি হয়েছে। দণ্ডটার উত্তরমুখী প্রান্তে **'উত্তর মেরু'** আর দক্ষিণমুখী প্রান্তে **'দক্ষিণ মেরু'** সৃষ্টি হয়।

ভাবো তো, কোনো চুম্বককে অবাধে ঝুলে থাকতে দিলে তা উত্তর-দক্ষিণ মুখ করে দাঁড়িয়ে থাকে কেন?

আমরা জেনেছি চুম্বকের বিপরীত মেরু পরস্পরকে আকর্ষণ করে। এবার ভেবে দেখো, পৃথিবীর ভৌগোলিক উত্তর মেরুতে কি কোনো চুম্বক মেরু আছে? একইভাবে পৃথিবীর ভৌগোলিক দক্ষিণ মেরুতেও কি কোনো চুম্বক মেরু আছে?

আসলে, চুম্বকের উত্তর মেরু বলে আমরা চুম্বকের যে প্রান্তকে নির্দেশ করি তা হলো **'উত্তর সন্ধানী মেরু'**। আর অপরটি **'দক্ষিণ সন্ধানী মেরু'**। সংক্ষিপ্ত করার জন্য এদের আমরা যথাক্রমে **'উত্তর মেরু ও দক্ষিণ মেরু'** বলি।

তড়িৎ-চুম্বক

একটা লোহার দণ্ড, একটা লম্বা অন্তরিত (প্লাস্টিকের আস্তরণ দেওয়া) তামার তার, একটা সুইচ, একটা শক্তিশালী ব্যাটারি আর একটা চুম্বক শলাকা নাও। লোহার উপর অন্তরিত তামার তার জড়িয়ে নাও। তারের দুই প্রান্ত ব্যাটারির ধনাত্মক ও ঋণাত্মক প্রান্তে সুইচসহ ছবির মতো করে যোগ করো। শলাকাটিকে তার জড়ানো লোহার দণ্ডের সামনে এনে সুইচ অন করো। বোঝার চেষ্টা করো শলাকার কাছাকাছি থাকা প্রান্তটিতে কোন ধরনের মেরুর সৃষ্টি হয়েছে। ব্যাটারির সঙ্গে যুক্ত তারের প্রান্তদুটোকে উলটে দাও। এবার সুইচ অন করে আবার দেখো,

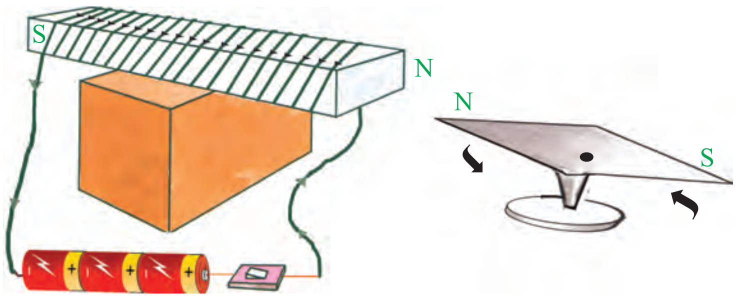

শলাকাটির কোন মেরু দণ্ডটির কোন প্রান্ত দ্বারা আকর্ষিত বা বিকর্ষিত হচ্ছে। চুম্বক শলাকার বিক্ষেপ ঘটল কেন? চুম্বক শলাকার মেরুতে কে আকর্ষণ বা বিকর্ষণ বল প্রয়োগ করল? এবার সুইচ অফ করে তড়িৎ প্রবাহ বন্ধ করে দাও। চুম্বক শলাকা আবার স্বাভাবিক অবস্থানে ফিরে এল কেন?

তাহলে কি তারের মধ্য দিয়ে তড়িৎ প্রবাহের ফলে লোহার দণ্ড চুম্বকে পরিণত হয়েছিল?

এই ধরনের চুম্বককে তড়িৎ-চুম্বক বলে।

চুম্বক ও তড়িৎ-চুম্বকের ব্যবহার

নৌকম্পাস

আমাদের দৈনন্দিন জীবনে চুম্বকের **নানাবিধ ব্যবহার** আছে। তার কয়েকটা নীচে দেওয়া হলো।

সমুদ্রবক্ষে দিক নির্দেশের জন্য নাবিকরা '**নৌকম্পাস**' ব্যবহার করেন। এতে একটা সূক্ষ্মাগ্র ধাতবদণ্ডের উপর একটা চুম্বক শলাকা বসানো থাকে।

অডিয়ো ক্যাসেট

অডিয়ো বা ভিডিয়ো ক্যাসেটের মধ্যে যে প্লাস্টিকের টেপ থাকে তার উপর চুম্বকিত পদার্থের আস্তরণ থাকে।

A.T.M.(AUTOMATED TELLER MACHINE) কার্ডে ও ক্রেডিট কার্ডে চুম্বকিত স্ট্রিপ (Magnetic strip) -এর ব্যবহার হয়।

কমপিউটারের হার্ডডিস্কে (Hard disk) প্লাস্টিকের চাকতির উপর চুম্বকিত পদার্থের কোটিং বা আস্তরণ থাকে।

বিভিন্ন খেলনাতে চুম্বকের ব্যবহার দেখা যায়।

কমপিউটারের হার্ডডিস্ক

চোখের ভিতর থেকে লোহার সূক্ষ্ম চূর্ণ বার করতে ডাক্তাররা এক বিশেষ **তড়িৎ চুম্বক যন্ত্র** ব্যবহার করেন।

লাউড স্পিকারে চুম্বকের ব্যবহার আছে।

সাইকেলের ডায়নামোতে চুম্বকের ব্যবহার হয়।

ইলেকট্রিক মিটারে চুম্বক ব্যবহৃত হয়।

ফ্রিজের দরজায় চুম্বক ব্যবহৃত হয়।

ইলেকট্রিক কলিংবেলে তড়িৎ চুম্বক ব্যবহৃত হয়।

ইলেকট্রিক মোটরে তড়িৎ চুম্বক ব্যবহৃত হয়।

কলিংবেল

চুম্বক ব্যবহৃত হয়েছে এমন জিনিস খুব সাবধানে ব্যবহার করা দরকার।

চুম্বক ব্যবহৃত হয়েছে এমন কোনো বস্তু কোনোভাবেই যেন খুব বেশি উত্তপ্ত না হয়। তাপের প্রভাবে চুম্বকের চুম্বকত্ব বিনষ্ট হতে পারে। দুটি ATM কার্ড বা ক্রেডিট কার্ডের যেদিকে চুম্বক স্ট্রিপ আছে সেই দিক মুখোমুখি একসঙ্গে যেন না থাকে।

লাউড স্পিকার, টি.ভি, রেডিয়ো, কম্পিউটারের হার্ডডিস্ক ইত্যাদির কাছে যেন কোনো শক্তিশালী চুম্বক না থাকে।

জীবের শারীরবৃত্তীয় ক্রিয়ায় চৌম্বক ক্ষেত্রের ভূমিকা

জীবজগৎকে ধরে রেখেছে যে পৃথিবী সে নিজেই একটা বিশাল চুম্বক। কোনো কোনো জীবের ওপর চৌম্বক শক্তির প্রভাব বিজ্ঞানীরা গবেষণা করে দেখেছেন। অনেক জীবের ক্ষেত্রে এখনও এর প্রভাব আমাদের অজানা থেকে গেছে।

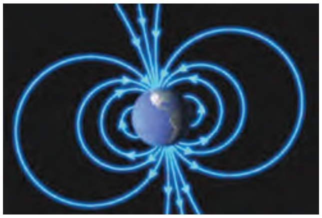

ভূচুম্বকের বলরেখা

ভূচুম্বকের বলরেখা উত্তর মেরু থেকে দক্ষিণ মেরু পর্যন্ত বিস্তৃত। আমরা পরিযায়ী পাখিদের কথা জানি। পরিযায়ী কিছু কচ্ছপও আছে। তারা পৃথিবীর চৌম্বক বলরেখা অনুসরণ করে আদি বাসভূমি থেকে শীতে পাড়ি দেয় এমন কিছু নির্দিষ্ট অঞ্চলে যেখানে গরম তুলনামূলকভাবে বেশি। আবার শীতের শেষে ওইভাবেই উৎসে ফিরে আসে।

মহাবিশ্ব থেকে এক ধরনের রশ্মি — মহাজাগতিক রশ্মি (cosmic ray) ক্রমাগত পৃথিবীর দিকে ধেয়ে আসে। এদের অধিকাংশই হলো তড়িৎযুক্ত কণিকা। ভূ-চৌম্বক ক্ষেত্রের সঙ্গে এদের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া ঘটে। ফলে মেরু অঞ্চল ঘিরে দুটি বিকিরণ বলয় (ভ্যান-অ্যালেন বিকিরণ বলয়) তৈরি হয় এবং উৎপন্ন হয় মেরু জ্যোতি বা অরোরা। এই জ্যোতি ওই অঞ্চলের জীবজগতের কাজে লাগে।

মেরুজ্যোতি

কী করে একটি প্রাণী সরাসরি এই চৌম্বক ক্ষেত্রকে চিনতে পারে?

পায়রার খুলি ও মস্তিষ্কের মাঝে একটা খুব ছোটো কালো গঠন আছে। এর মধ্যে ম্যাগনেটাইট নামে এক ধরনের চৌম্বকীয় বস্তু আছে। ঘরে ফেরা পায়রারা মেঘলা অন্ধকার দিনে কোনো পরিচিত চিহ্ন না দেখতে পেলেও ঠিকঠাক ঘরে ফিরে আসে। কিছুক্ষণ এদিক সেদিক ওড়ার পর তারা সঠিক দিকে চলতে শুরু করে। মজার ব্যাপার হলো, এদের মাথায় এক টুকরো চুম্বক লাগিয়ে দিলে চলার দিক পরিবর্তিত হয়। কোনো কোনো শামুক, মৌমাছিদের মধ্যেও ম্যাগনেটাইটের অস্তিত্বের কথা জানা গেছে।

তড়িৎ

তড়িৎ প্রবাহ

তড়িৎ-এর সাহায্যে চলে এমন কয়েকটা জিনিসের নাম লেখো।

ধরো, রাত্রিবেলায় লোডশেডিং হয়েছে, অথবা অন্য কোনো কারণে বিদ্যুৎ সরবরাহ বিচ্ছিন্ন হয়েছে,

এসব ক্ষেত্রে বৈদ্যুতিক আলো পেতে মানুষ কী কী ব্যবহার করে?

তোমরা সবাই টর্চ দেখেছ। অন্ধকারে টর্চের আলোয় আমরা পথ চলি। টর্চের ভিতরে কী থাকে তা কি কখনও দেখেছ?

ব্যাটারি

ব্যাটারি

নির্জল কোশ/সেল

ব্যাটারি

টর্চের ভিতর তোমরা যাকে ব্যাটারি বলে জানো তা হলো **Dry cell** বা **নির্জল কোশ**। চলতি কথায় একে শুধু, **সেল (cell)** - ই বলে। **একাধিক সেল -এর সমবায়ে তৈরি হয় ব্যাটারি।**

'সেল' ছাড়া টর্চ জ্বলে না। আবার 'সেল' যুক্ত করলেই টর্চ জ্বালালে জ্বলে। তাহলে, টর্চের বৈদ্যুতিক বালব জ্বালার জন্য প্রয়োজনীয় শক্তির জোগান দেয় '**সেল**'।

জেনে রাখা দরকার

টর্চের সেলের ভিতরে থাকে রাসায়নিক পদার্থ। এই রাসায়নিক পদার্থের ব্যবহারের ফলে রাসায়নিক শক্তি বিদ্যুৎ শক্তিতে রূপ বদল করে। এই সেলকে বলে '**প্রাইমারি সেল**' বা '**ডিসপোজেবল সেল**'।

একটা সেল নাও। খুব ভালো করে সেলটাকে লক্ষ করো। এবার দেখো '+' **চিহ্ন** কোথায় আছে?

যে প্রান্তে '+' **চিহ্ন** আছে তার উলটো প্রান্তে কী চিহ্ন আছে?

এবার দেখো সেলের কোন প্রান্তে একটা ধাতুর তৈরি টুপি রয়েছে? '+' **চিহ্ন** দেওয়া প্রান্তে, না '–' **চিহ্ন** যুক্ত প্রান্তে?

দেখো তো সেলটির অপর প্রান্তে কী আছে?

দেখা গেল, একটা 'সেলের' দুটি প্রান্ত,

'ধাতব টুপি' প্রান্ত বা '+' চিহ্নিত প্রান্ত,

'ধাতব চাকতি' প্রান্ত বা '–' চিহ্নিত প্রান্ত।

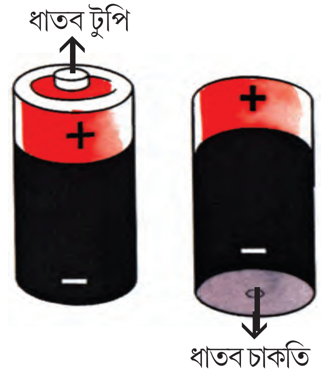

জেনে রাখা ভালো

বাজারে আরো অনেক রকমের সেল আছে।

ইলেকট্রনিক হাতঘড়িতে যে 'সেল' থাকে তা দেখতে অনেকটা বোতামের মতো। একে **বোতাম সেল (Button Cell)** বলে।

গাড়ির শক্তিশালী ব্যাটারিতে থাকে ছটা বা তার বেশি সেল। এই ধরনের সেলকে **'সেকেন্ডারি সেল'** বলে।

বাড়ির বড়োদের সাহায্যে টর্চের বালবটাকে বার করো। ভালো করে লক্ষ করো।

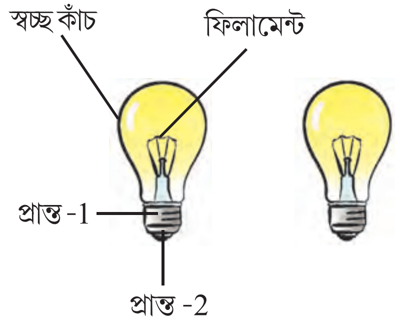

টর্চের সুইচ অন করলে বালবের ভিতরে যে অংশটা জ্বলে ওঠে তাকে বলে **ফিলামেন্ট**। ফিলামেন্ট, দুটো মোটা ধাতব তারের মাঝে থাকে। ওই তার দুটোর একটা সেলের **ধনাত্মক প্রান্তে (+ চিহ্নিত প্রান্তে)** এবং অপরটি সেলের **ঋণাত্মক প্রান্তে (- চিহ্নিত প্রান্তে)** যুক্ত থাকে।

হাতেকলমে 1

একটা টর্চের বালব, এক বা একাধিক সেল, বিভিন্ন রঙের পাঁচটা প্লাস্টিক আবরণযুক্ত পরিবাহী তার, ব্ল্যাক টেপ ও রাবার ব্যান্ড (গার্টার) জোগাড় করো।

প্রতিটি তারের দু-প্রান্তে খানিকটা প্লাস্টিক আবরণ (প্লাস্টিক কোটিং) ছাড়িয়ে নিয়ে ধাতব অংশ বার করে রাখো।

সেলের দু-প্রান্তে একটা করে তার যুক্ত করো।

বালবটার দু-প্রান্তে একটা করে তার যুক্ত করো।

এবার পরের পৃষ্ঠার ছবিতে, যেভাবে দেখানো হয়েছে, সেইরকম বিভিন্নভাবে তারগুলো যুক্ত করো। দেখো কোন ক্ষেত্রে আলো জ্বলছে। (ছবির নীচে দেওয়া লেখা থেকে ঠিক উত্তরটি বেছে নাও)

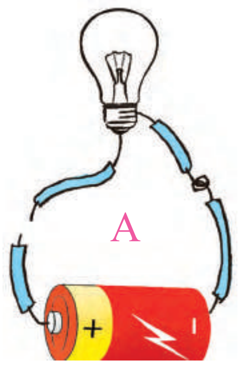

আলো জ্বলছে/আলো জ্বলছে না

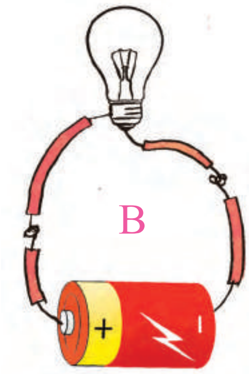

আলো জ্বলছে/আলো জ্বলছে না

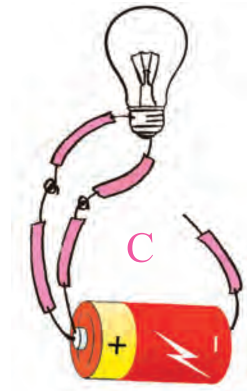

আলো জ্বলছে/আলো জ্বলছে না

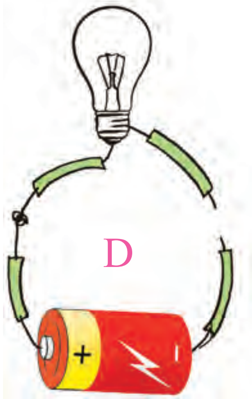

আলো জ্বলছে/আলো জ্বলছে না

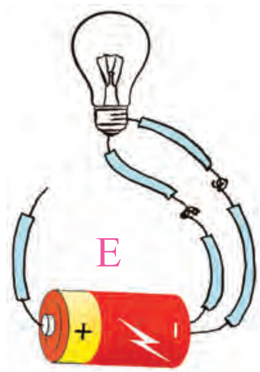

আলো জ্বলছে/আলো জ্বলছে না

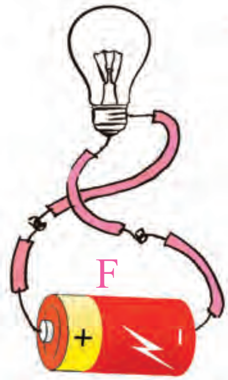

আলো জ্বলছে/আলো জ্বলছে না

হাতেকলমে 2

এবার দুটো সেল পাশাপাশি বসিয়ে নিয়ে বালবটা জ্বালাও।

কী দেখলে?

বালবটার আলো আরও বেশি জোরালো হলো কি?

বোঝা গেল যে একটার বদলে দুটো সেল পাশাপাশি বসালে তড়িৎশক্তির পরিমাণ বাড়ে।

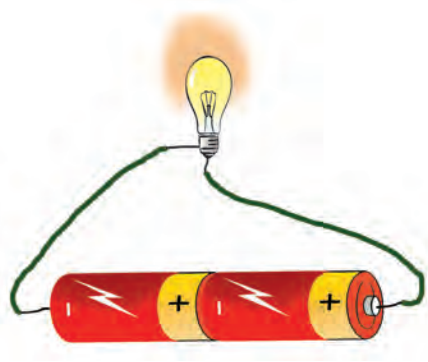

'হাতেকলমে 1' -এর পরীক্ষায় দুটি ক্ষেত্রে আলো জ্বলেছে (B ও F)।

এই দুই ক্ষেত্রেই বালবের দুই প্রান্তের সঙ্গে সেলের দুই প্রান্ত যুক্ত করা হয়েছে। এই ব্যবস্থাকে বলা হয় **সার্কিট বা বর্তনী**।

বর্তনী আঁকার জন্য কয়েকটি প্রতীক নীচের সারণিতে দেওয়া হলো।

	সেল		বড়োদাগটা (|) '+' প্রান্ত বোঝায় ছোটোদাগটা(।) '—' প্রান্ত বোঝায়
	ব্যাটারি (দুই সেলের)		×
	সুইচ	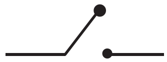	সুইচ 'অফ' অবস্থা
	সুইচ		সুইচ 'অন' অবস্থা
	তার		×
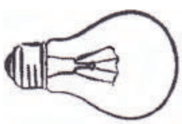	বালব		×

হাতেকলমে 3

ছবির মতো করে একটা বর্তনী তৈরি করো।

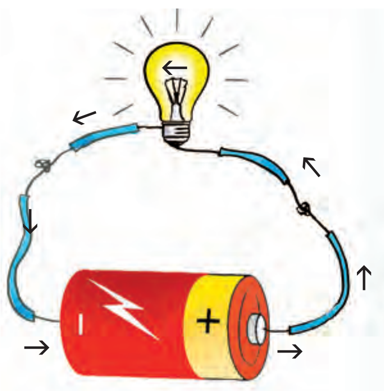

বালবটা কি জ্বলছে?

যদি বালবটা জ্বলে তবে বর্তনী ঠিক আছে।

এবার একটা স্কেচ পেন নাও। সেলের '+' প্রান্ত থেকে তার বরাবর স্কেচ পেন দিয়ে বালব অবধি দাগ দাও।

সেল থেকে তড়িৎ তোমার পেনের দাগ বরাবর তারের মধ্যে দিয়ে বালবের এক প্রান্তে পৌঁছোয়।

বালবটা যেহেতু জ্বলছে, তাই তড়িৎ বালবের ভিতরের তার আর ফিলামেন্ট ধরে বালবের অপর প্রান্তে এসে পৌঁছোয়।

এবার বালবের অপর প্রান্ত থেকে শুরু করে তার বরাবর সেলের '−' প্রান্ত অবধি স্কেচ পেন দিয়ে দাগ দাও।

এবার প্রতীকের সাহায্যে বর্তনীটি পাশে আঁকা হলো। ভালোভাবে বর্তনীটি লক্ষ করো।

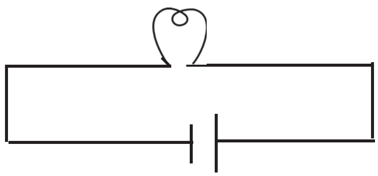

আগের পৃষ্ঠার সারণিতে দেওয়া প্রতীকের সাহায্যে কীভাবে পাশের বর্তনীটি আঁকা হয়েছে তা নিশ্চয়ই বুঝেছ।

এবার নীচের বাঁ দিকের ছবি দেখে তার বর্তনীটি ডানদিকে আঁকো।

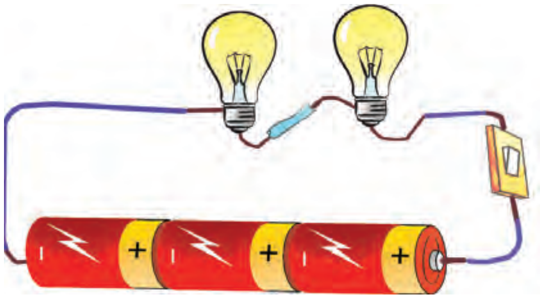

নীচের ছবিগুলি খুঁটিয়ে দেখো ও ছবির সঙ্গে যুক্ত প্রশ্নগুলির উত্তর দাও।

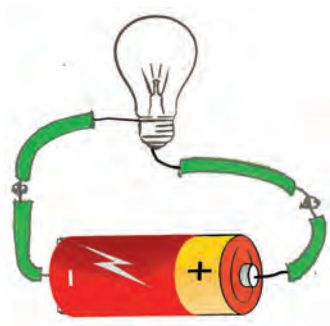

আলো কি জ্বলবে? ......

আলো কি জ্বলবে? ......

আলো কি জ্বলবে? ......

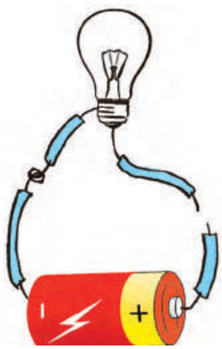

আলো কি জ্বলবে? ......

আলো কি জ্বলবে? ......

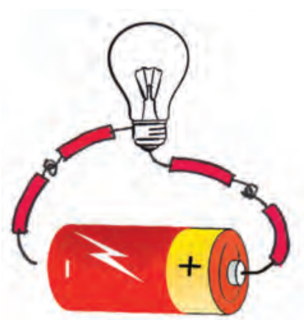

আলো কি জ্বলবে? ......

বর্তনী কোথাও ছিন্ন হয়ে গেলে, তার মধ্যে দিয়ে তড়িৎ চলাচলে বাধা পড়ে। তখন বর্তনী কাজ করে না।

তখন ওই বর্তনীকে **মুক্ত বর্তনী** বলে। আর যদি বর্তনী কোথাও ছিন্ন না হয় তখন ওই বর্তনীকে **বন্ধ বর্তনী** বলে।

হাতেকলমে 4

একটা থার্মোকলের টুকরো বা কাঠের টুকরো, একটা সেফটিপিন, আর দুটো বোর্ডপিন নাও। নীচের ছবির মতো ব্যবস্থা করো।

দুটো পিনের দূরত্ব এমন হবে, যাতে দ্বিতীয় পিনে গাঁথা সেফটিপিনকে ঘুরিয়ে প্রথম পিনে স্পর্শ করা যায়।

ব্যাস, তুমি বানিয়ে ফেলেছ একটা সুইচ।

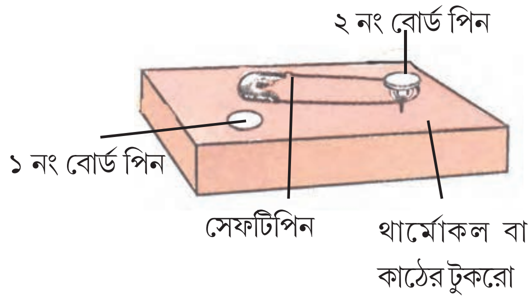

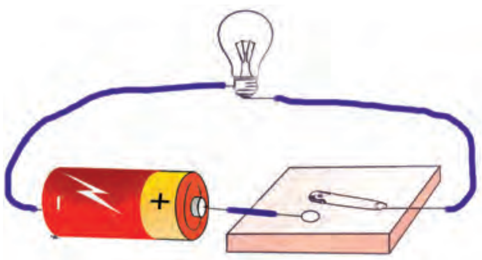

একটা বালব, তিনটে তার, আর একটা সেল নাও। এবার পাশের বর্তনীটি তৈরি করো।

সেফটিপিনটা ছবিতে যেমন দেখানো আছে তেমনভাবে রয়েছে।

বালবটা কি জ্বলবে?

এবার সেফটিপিনটা ঘুরিয়ে প্রথম পিনে স্পর্শ করা হলো।

বালবটা কি জ্বলবে?

তোমার বাড়িতে যে সব ইলেকট্রিকের সরঞ্জামের মধ্যে সুইচ আছে তার মধ্যে প্রায় সব সুইচই এই নীতিতে কাজ করে।

হাতেকলমে 5

একটা সেল, একটা টর্চের বালব, আর তিনটে তার নাও। তারগুলোর দুই প্রান্তে প্লাস্টিক ছাড়িয়ে কিছুটা ধাতব তার বার করে রাখো।

এবার পরের পৃষ্ঠার ছবির মতো করে তার, সেল ও বালব লাগাও। ব্যাস, তৈরি হলো তোমার বর্তনী পরীক্ষক বা টেস্টার।

এখন, একটা কাঠের ও একটা প্লাস্টিকের স্কেল ,একটা লোহার পেরেক, একটা সুতির কাপড়ের টুকরো, একটা স্টিলের চামচ, একটা চাবি, একটা কাগজের টুকরো, চিনে মাটির একটা কাপ নাও।

এবার তোমার তৈরি টেস্টারটা নাও। উপরের প্রতিটি জিনিসের দু-প্রান্তে তোমার টেস্টারের A ও B প্রান্ত স্পর্শ করো। লক্ষ করো, কোন ক্ষেত্রে বালবটি জ্বলছে।

যে যে ক্ষেত্রে বালব জ্বলছে, সেই বস্তুগুলোর মধ্য দিয়ে নিশ্চয়ই তড়িৎ প্রবাহিত হচ্ছে।

এই বস্তুগুলোকে বলে **'তড়িতের সুপরিবাহী'** ।

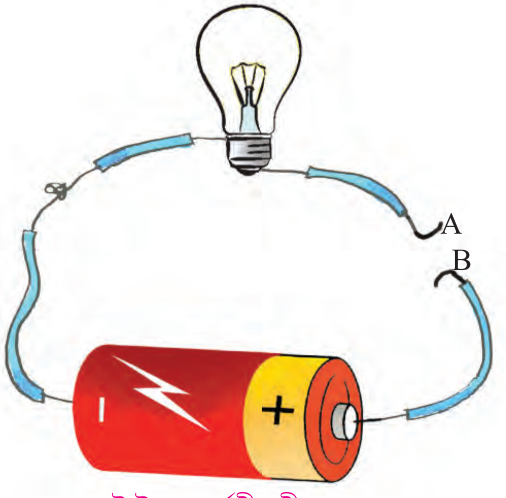

টেস্টার বা বর্তনী পরীক্ষক

যেসব ক্ষেত্রে বালব জ্বলছে না, সেই বস্তুগুলোর মধ্য দিয়ে তড়িৎ প্রবাহিত হতে পারে না। তাই এদের **তড়িৎ-এর 'কুপরিবাহী'** বা অন্তরক বলে।

বস্তুর নাম	আলো জ্বলছে বা জ্বলছে না	এর মধ্যে দিয়ে তড়িৎ যেতে পারে বা পারে না	তড়িতের সুপরিবাহী বা কুপরিবাহী
কাঠের স্কেল			
প্লাস্টিকের স্কেল			
লোহার পেরেক			
সুতির কাপড়			
স্টিলের চামচ			
চাবি			
কাগজের টুকরো			
চিনেমাটির কাপ			

উপরের সারণিটি পূরণ করো।

তোমার টেস্টারটা তো বায়ুর মধ্যে আছে। তাহলে টেস্টারের 'A' ও 'B' প্রান্ত বায়ুকে স্পর্শ করেই রয়েছে, তাই না? কিন্তু বালব তো জ্বলছে না!

তাহলে বায়ু কি সুপরিবাহী না কুপরিবাহী?

এক্ষেত্রে বর্তনীটি কি বন্ধ না মুক্ত?